সীমানা ছাড়িয়ে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ অগাস্ট ১৯৬৪

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ
প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ
বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মধুমিতা (কুমকুম) বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

॥ এক ॥

বাঁদিকে তালপুকুর। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। কোন রকমে একটা লোক পায়ে হেঁটে যেতে পারে।

মোহন সে রাস্তা দিয়ে গেল না। ওখান দিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি তাদের গাঁয়ে পৌঁছানো যাবে। হাতে অঢেল সময়। অত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার তার দরকার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িতে যেতেই তার ভাল লাগে না।

বাড়ি গেলেই ঠিক কোন না কোন কাজ তার ঘাড়ে পড়বে। সৎমা যেন তার জন্য কাজ নিয়ে তৈরি থাকে।

বাচ্চাটাকে ধর, কিংবা বাগানের বেড়াটা আলগা হয়ে গেছে, একটু শক্ত করে বেঁধে দে, না হয় সুপারিগুলো রোদে দিয়ে আয়।

অথচ বাড়িতে ঝি আছে, মালী আছে, কিন্তু মোহনকে দেখলেই সৎমার কাজ করাতে ইচ্ছা করে।

তাই মোহন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে না। সাত রাজ্যি ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন মাঠ পার হয়ে, সাঁকোর ওপর দিয়ে স্টেশনে গিয়ে বসে। ট্রেন দেখতে তার খুব ভাল লাগে। একটা ট্রেন এসে দাঁড়ায় আর তার কামরাগুলো থেকে হুড় হুড় করে লোক নামে। কিছুক্ষণের জন্য হৈ চৈ।

গার্ডের সবুজ নিশান দোলানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন তার অজগর দেহটা দুলিয়ে তেপান্তরের দিকে পাড়ি দেয়।

স্টেশন আবার ফাঁকা। গোলমাল থেমে যায়।

কোন কোনদিন মোহন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এই সময় তার সঙ্গী বিশেষ কেউ থাকে না। সবাই স্কুল ফেরত সোজা বাড়ি চলে যায়। বলে, না ভাই, না গেলে মা ভাববে।

মোহন তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে তার সৎমা চিন্তিত হয়

না, বিরক্ত হয়। বলে, কাজের ভয়ে কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল এতক্ষণ? যেমন দেরি করে এসেছ, তেমনি তোমার খাওয়া বন্ধ। আর খাওয়া পাবে সেই রাত্রে।

মোহন কিছু বলে না। চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর চাটাইয়ের উপর বইখাতা ছড়িয়ে খিড়কি-পুকুরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে আসে। একটু পরেই বিন্দুর মা এসে হেরিকেনটা জ্বালিয়ে রেখে যায়।

মোহন গামছা দিয়ে হাত-পা মোছা শেষ করার আগেই বিন্দুর মা আবার ঘরে ঢোকে। হাতে কলাইয়ের বাটি। তাতে তেল-নুন মাখা মুড়ি। মাঝে মাঝে তাতে কড়াইশুঁটিও ছড়ানো থাকে। নাও, খেয়ে নাও।

গালাগাল বকুনিতে মোহনের কষ্ট হয় না। এসব তার গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু নরম সুরের কথা শুনলেই মোহনের দুটো চোখ জলে ভরে আসে।

ঝি বিন্দুর মা মোহনের মায়ের আমলের লোক।

মায়ের কথা মোহনের খুব আবছা মনে আছে। অনেক আগের কোন স্বপ্ন দেখার মতন। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার যে কোনদিন মা ছিল, এটাই যেন স্বপ্ন।

মা মারা যাবার পর সৎমা এল বাড়িতে। কিন্তু তার এই নতুন মা ভালো না; বড় কষ্ট দেয় মোহনকে।

বাড়ির দিকে নজর দেবার সময় নেই বাবার। সকাল বেলা চা-রুটি খেয়ে সাইকেলে চড়ে বের হয়ে যায়।

খালের ধারে কাপড়ের দোকান।

পাশাপাশি তিনটে কাপড়ের দোকান, তার মধ্যে মহামায়া বস্ত্রালয়ের বিক্রি সবচেয়ে বেশী। এই মহামায়া মোহনের মায়ের নাম। পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও মোহন মায়ের সন্ধান পাবে না। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে যেমন আলোর শিখা হারিয়ে যায়, তেমনই মোহনের মা-ও হারিয়ে গেছে। শুধু ওই সাইন-বোর্ডের ওপর জ্বলজ্বল করে মায়ের নামটা। স্কুল ফেরত মোহন

খালের ধারে এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে মায়ের নামটার দিকে চেয়ে থাকে। বানান করে করে পড়ে। কাছে যাবার সাহস নেই, কি জানি যদি বাবার চোখে পড়ে যায়।

সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। স্কুল ফেরত মোহন সোজা মজুমদারদের বাগানে ঢুকল। এক সময় সাজানো বাগান ছিল, ইদানীং আগাছায় ভর্তি।

মজুমদাররা সবাই শহরে থাকে। কালেভদ্রে এখানে আসে। সব কিছু দেখে মালী। মোহন একলা নয়, সঙ্গে পল্টু আর শিবু। দু'জনেই সমান ডানপিটে।

পল্টুর খবর, গাছে নাকি কামরাঙ্গা পেকে লাল হয়ে আছে। বেশী উঁচুতে নয়, হাত বাড়িয়েই পাড়া যায়।

মোহন মোটেই কামরাঙ্গার ভক্ত নয়। শুধু সময় কাটাবার জন্য সে এদের সঙ্গে এসেছে। সোজা বাড়ি যাবার তার একটুও ইচ্ছা নেই।

পল্টু আর শিবু যখন একমনে কামরাঙ্গা পাড়ছিল, তখন হঠাৎ মালীর আবির্ভাব। মালী গাছের আড়াল দিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। সে বলল, এই যে, কামরাঙ্গা—

কিন্তু সব কথাটা আর তার বলতে হলো না। শিবের হাতের একটা ঢিল সবেগে এসে পড়ল মালীর কপালে।

ওরে বাবারে, বলে চীৎকার করে মালী মাটির ওপর বসে পড়ল।

পল্টু, শিবে আর মোহন তিনজনেই হাওয়া।

এদিক-ওদিক ঘুরে মোহন যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো।

মালী বসে হাউমাউ করে কাঁদছে, দেখে মনে হলো, সে অনেক আগেই নালিশ করতে এসেছিল। যা কিছু বলার সবই বলা হয়ে গিয়েছিল। মোহনকে চোখের সামনে দেখে আবার তার

শোক নতুন করে জেগে উঠল।

মালীর সামনে নতুন মা দাঁড়িয়ে। হেরিকেনের অল্প আলোতেও দেখা গেল, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মোহনকে দেখেই নতুন মা চেঁচিয়ে উঠল।—ওই যে শয়তানটা এসেছে। হ্যাঁরে হতচ্ছাড়া, হলধরকে অমনভাবে মেরেছিস কেন? আর একটু হলে যে চোখটা যেত।

মোহন জোর গলায় বলল, আমি মারিনি।

মারিসনি? হলধর মিথ্যা কথা বলছে? সর্বনেশে ডাকাত! নতুন মা ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই মোহন দ্রুত পিছু হটে এল। তারপরই উঃ বলে একটা আর্তনাদ করে উঠানের ওপর বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে কে তার চুলের মুঠি ধরে পিঠের ওপর আঘাতের পর আঘাত করতে আরম্ভ করেছে।

মোহনের মনে হলো, মেরুদণ্ড বুঝি ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে।

পিছন ফিরেই মোহন দেখতে পেল, তার বাবা উগ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে, হাতে সাইকেলের পাম্প। সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া।

বাবার হাতে মার খাওয়া মোহনের এই প্রথম।

হাতের বইখাতাগুলো আগেই উঠোনের ওপর ছিটকে পড়েছিল। এবার বাবা তেড়ে আসতেই মোহন পাশ কাটিয়ে তীর বেগে দৌড়তে শুরু করল। রাস্তা ধরে নয়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ল।

এই অন্ধকারে জঙ্গল মোটেই নিরাপদ নয়। সাপখোপের ভয় আছে। কিন্তু মোহন সে সব কিছু ভাবল না। তার বুক জুড়ে দুরন্ত অভিমান। বাবা কিছু খোঁজ না নিয়েই, কেবল নতুন মায়ের কথার ওপর নির্ভর করে এভাবে তাকে মারল!

মোহন ঢিল ছোঁড়েনি। কে ছুঁড়েছে মালী হয়তো খেয়াল করেনি। মোহনকে দেখতে পেয়ে তার নামেই নালিশ করতে এসেছে। শিবু আর পল্টু বেপাড়ার ছেলে। মালী তাদের

নামও জানে না। তাই যাকে চেনে তার বাড়িতেই এসে হাজির হয়েছে।

চোখের জলে সামনের সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে মোহনের। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে মোহন আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর বাড়িতে নয়। কোনদিন আর সে এখানে ফিরবে না। তার নিজের মা থাকলে কখনো তাকে এভাবে মার খেতে হতো না। মাকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় বিশ্বাস করত। মা জানত, মোহন মিথ্যে কথা বলে না।

হঠাৎ তীব্র একটা শব্দে মোহন চমকে উঠল। জঙ্গলের ওপাশ দিয়ে ট্রেন চলছে। সার্চলাইটের তীব্র আলোয় জঙ্গলের এক অংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের গতি খুব জোর নয়। তার মানে স্টেশন কাছে।

মোহন মন ঠিক করে ফেলল। ট্রেনে চড়ে শহরে চলে যাবে। শহর কলকাতা। যে শহরে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রেও আলোর মায়ায় দিন বলে মনে হয়। মানুষগুলো হাঁটে না, ছোটে।

মোহন কখনো কলকাতা যায়নি। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে যারা দু-একজন গেছে, তাদের কাছে গল্প শুনেছে। চিড়িয়াখানা, লেক, মিউজিয়ম, সার্কাস আরো কত কি!

মোহনের বাবাও বেশ কয়েকবার কলকাতায় গেছে এবং এখনো যথারীতি যেতে হয় তাকে। হাওড়ায় বুঝি হাট হয়, সেখান থেকে কাপড় কিনে এনেছে দোকানের জন্য। ফিরে এসে নতুন মায়ের কাছে কলকাতার ঐশ্বর্যের কাহিনী বলেছে।

গাছের তলায় বসে মোহন একটু বিশ্রাম করল। একটানা ছুটে দুটো পা-ই টনটন করছে। খিদেও কম পায়নি। সেই ভোর বেলা ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়েছিল। টিফিনের সময় একটা পেয়ারা আর গোটা কয়েক কুল খেয়েছে।

বেশীক্ষণ বসে থাকতে মোহনের সাহস হলো না। ঘাসের মধ্যে

সাপ কিংবা বিছা থাকতে পারে।

এতক্ষণ সে বাঁচা-মরার কথা ভাবেনি। বাড়ির লোকদের ওপর, পৃথিবীর ওপর তার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

কিন্তু ট্রেনটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচবার ইচ্ছা মনে জাগল। আর জাগল শহরে যাবার ইচ্ছা।

স্টেশনে পৌঁছে মোহন একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

কাছেই কেরোসিনের আলো। সেই আলোতে দেখল, দুটো হাতে কালসিটে পড়েছে। মার আটকাবার জন্য হাত তোলার সময় চোট হাতের ওপর পড়েছে।

দু' পায়ে রক্তের ধারা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছোটবার সময় খেয়াল ছিল না, কাঁটাগাছের ওপর পা গিয়ে পড়েছিল।

মোহন আস্তে আস্তে উঠে টেপাকলে পা দুটো ধুয়ে নিল। মুখহাতও। তারপর বেঞ্চে ফিরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখল, প্রায় চল্লিশ পয়সা রয়েছে। রোজ বাবার দেওয়া জল-খাবারের পয়সা জমিয়ে রেখেছিল। ইচ্ছা ছিল সামনের বিশ্বকর্মা পূজার আগে ঘুড়ি আর সুতো কিনবে।

কিন্তু এখনই কিছু মুখে না দিলে মোহন দাঁড়াতেই পারবে না। মারের ব্যথা তো রয়েইছে, তার ওপর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। খিদের যন্ত্রণায়।

স্টেশনের পাশেই দোকান। লুচি আছে, ডাল, তরকারি, কিছু মিষ্টি। মোহন লুচি আর তরকারি খেল কুড়ি পয়সার।

পয়সা দিয়ে স্টেশনে এসে খেয়াল হলো, পকেটে আর মাত্র কুড়ি পয়সা আছে। সর্বনাশ, কলকাতা যাবার ভাড়া? মাত্র কুড়ি পয়সায় নিশ্চয় কলকাতা যাওয়া যায় না। অথচ বাড়ি ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

যেখানে টিকিট দেয় মোহন পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে একজন লোক খুব মনোযোগ দিয়ে মোটা একটা বই পড়ছে। চোখে পুরু কাচের চশমা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল।

মোহন জিজ্ঞেস করল, কলকাতার ট্রেন কখন আসবে?

লোকটা মুখ না তুলেই বলল, আটটা পঁচিশ।

মোহন নীচু হয়ে দেখল। লোকটার পিছনের দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি। সেই ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। এখনো ট্রেন আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক।

আবার মোহন স্টেশনের বেঞ্চে গিয়ে বসল।

দু'একজন করে লোক জমছে স্টেশনে। প্রায় সকলেরই কাঁধে গোটানো বিছানাপত্র, হাতে লাঠি।

এক সময় ট্রেন এল। স্টেশন কাঁপিয়ে। ঝম-ঝমা-ঝম।

ট্রেনের অবস্থা দেখে মোহনের চোখ কপালে উঠল। কামরায় কামরায় লোক যেন উপচে পড়ছে। পাদানিতে পর্যন্ত লোক। কি করে মোহন ট্রেনে উঠবে? পা রাখবারও স্থান নেই।

এক জায়গায় গোটা চারেক লোক নামল। উঠল আরো বেশী। মোহনের যখন খেয়াল হলো, দেখল লোকগুলোর ধাক্কায় কখন সে কামরার মধ্যে ছিটকে পড়েছে—বিরাট এক বিছানার বাণ্ডিলের পিছনে।

ট্রেন ছাড়তে লোকগুলোর কথায় বুঝতে পারল, কয়েক স্টেশন পরেই বিরাট এক মেলা শুরু হয়েছে। জায়গাটার নাম শুক-দেবপুর। সেই স্টেশনেই অনেক লোক নেমে যাবে।

চোখ ঘুরিয়ে মোহন এদিক ওদিক দেখল। কাছের বেঞ্চে তার বয়সী একটি ছেলে বসে আছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে।

মোহনের চোখ তার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতেই সে প্রশ্ন করল, তোমার সারা গা এত কেটে গেল কি করে?

মোহন একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর বলল, সাইকেল থেকে পড়ে গেছি।

কোন ওষুধ দাওনি?

মোহন মাথা নাড়ল, না।

ছেলেটি মাথার কাছে টাঙ্গানো ঝোলা থেকে একটা মলমের

কৌটো বের করে মোহনের হাতে দিয়ে বলল, এটা লাগিয়ে দাও। দেখবে ব্যথা অনেক কমে গেছে।

হাতে পায়ে মলম লাগিয়ে কৌটোটা ছেলেটিকে ফেরত দেবার সময় মোহন জিজ্ঞাসা করল, কখন কলকাতায় পৌছাব?

রাত সাড়ে দশটা। আমরা অবশ্য তার আগেই নেমে যাব।

ছেলেটির কথা শুনে মোহন একটু চিন্তিত হলো।

ভেবেছিল, ছেলেটি যদি কলকাতা পর্যন্ত যায় তাহলে তার সঙ্গে যাবার সুবিধা হবে। অজানা, অচেনা ওই বিরাট মহানগরীতে একলা একলা মোহন কি করবে? কোথায় যাবে?

তাছাড়া ভিড় কমে গেলে টিকিট চেকার ট্রেনে উঠতে পারে।

মোহনের সামনে যদি টিকিটের জন্য হাত পেতে দাঁড়ায়, তাহলে মোহন কি করবে? তার সম্বল তো মাত্র কুড়িটা পয়সা। ছেলেটা থাকলে হয়তো কিছু সুরাহা হতে পারে। ট্রেনের কামরায় টিকিট চেকার ওঠার কথা মোহন তার বাবার কাছেই শুনেছে।

যারা টিকিট দেখাতে পারে না, তাদের চেকার নামিয়ে রেলের পুলিশের হাতে জমা দিয়ে দেয়। মোহনকেও কি তাই করবে!

ট্রেনের দোলানির সঙ্গে মোহনের ঝিমুনি এল। চোখ দুটো আর সে খোলা রাখতেই পারছে না। হেলান দিয়ে মোহন চোখ বন্ধ করল।

যখন চোখ খুলল তখন বেশ রাত। কামরায় ভীড় অনেক কম।

মোহন চোখ খুলেই সামনের বেঞ্চের ছেলেটিকে খুঁজল। সে নেই। তার সঙ্গের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বোধহয় তার বাবা মা-ই হবেন, কেউ নেই। কামরা জুড়ে সব নতুন লোক।

চোখে ঘুমের ঘোর রয়েছে। মোহন বেশীক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারল না, আবার চোখ বন্ধ করল।...

এবার ঘুম ভাঙ্গল হৈ চৈ চীৎকারে।

কামরা খালি। ট্রেন আর চলছে না। দু'জন ঝাড়ুদার মোহনের

সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।

সব যাত্রী নেমে গেছে। ঝাড়ুদার কামরা পরিষ্কার করতে এসেছে।

উঠে বসতে গিয়ে মোহন টের পেল সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। গায়ে হাত রাখা যায় না এমন গরম। কাতর চোখে ঝাড়ুদারদের দিকে চেয়ে মোহন বলল, আমাকে একটু ধরবে, আমি উঠতে পারছি না।

একজন ঝাড়ুদার এগিয়ে এসে মোহনের হাত ধরল। ধরেই বলল, ইস, তোমার তো খুব বোখার হয়েছে। সঙ্গে কে আছে তোমার ?

মোহন মাথা নাড়ল। কেউ নেই।

একজন ঝাড়ুদার সাবধানে মোহনকে ধরে নামিয়ে আনল। সারা প্ল্যাটফর্মে জল। একটু আগে ধুয়েছে। এখানে বসবার উপায় নেই।

ঝাড়ুদার বলল, চল, তোমাকে ওদিকে বসিয়ে দিই। মোহনকে নিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের এদিকে এসে দাঁড়াল।

দেয়ালের ধারে একগাদা ভিখারি শুয়ে-বসে রয়েছে। তার মধ্যে মোহনের বয়সী অনেক ছেলেও আছে। মোহনকে সেখানে বসিয়ে ঝাড়ুদার চলে গেল।

মোহনের বসে থাকার মতো শক্তি নেই। সে প্ল্যাটফর্মের ওপর শুয়ে পড়ল। তেষ্টায় গলার ভিতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। একটু জল পেলে হতো।

ধারে-কাছে যে ভিখারির ছেলেগুলো রয়েছে, তাদের বললে টিনের কৌটো করে একটু জল নিশ্চয় এনে দেবে। কিন্তু বলতে গিয়ে মোহনের গলা থেকে স্বর বের হলো না। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল। প্রথম মনে হলো, রাগের ঝোঁকে বাড়ি ছেড়ে এসে সে ভুলই করেছে। এর চেয়ে নতুন মায়ের গালাগাল, মার খাওয়া ভাল ছিল। বাবার বকুনিও।

এই খোকা, এই !

প্রথমে খুব অস্পষ্ট, তারপর মোহনের কানে গেল। চোখ খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। এই মাত্র স্নান করে এসেছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। লোকটি বলল, কাদের ছেলে ? এখানে শুয়ে আছ কেন ?

অনেক কষ্টে মোহন উঠে বসে বলল, খুব জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছি না।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। মুখ থমথম করছে। এখানে যাবে কোথায় ? কে আছেন তোমার শহরে ?

কেউ নেই।

সর্বনাশ, এই জ্বর নিয়ে বিপদে পড়বে যে ? বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ ?

মোহন মাথা নীচু করে রইল।

ওঠ বাবা, ওঠ। আমার সঙ্গে চল। তোমাকে সারিয়ে-টারিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার শান্তি। লোকটি নীচু হয়ে মোহনের একটা হাত ধরল। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আবার বলল, ছি বাবা, মা-বাবা হচ্ছেন গুরুজন। তাঁদের ওপর কি রাগ করতে আছে! একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, তাঁদের চেয়ে আপনজন আর সংসারে কেউ নেই। তাঁরা বকেন মারেন ভালোর জন্যেই।

স্টেশনের বাইরে এসে মোহন অবাক। এই বুঝি হাওড়ার পুল। লোহার ওপর লোহা সাজিয়ে কি বিরাট ব্যাপার, ভাবাই যায় না। ওপর দিকে দেখলে ঘাড় টন টন করে।

সামনের রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে। কেবল মানুষ আর মানুষ। তা ছাড়া, বাস, ট্যাক্সি আর ট্রাম। অগণিত। জীবনে মোহন এই প্রথম ট্রাম দেখল।

বাস সে দেখেছে। আর একবার জমিদার বাড়ির ছেলেরা শহর থেকে একটানা ট্যাক্সি করে এসেছিল। মোহনদের স্কুলের

সামনেই ট্যাক্সি থেমেছিল। স্কুলের ছেলেরা ভিড় করেছিল ট্যাক্সি দেখবার জন্যে।

পুলের তলায় ঘোলাটে জলের স্রোত। বহু লোক স্নান করছে। এই তাহলে গঙ্গা!

মোহন যখন গঙ্গা দেখতে ব্যস্ত, তখন তার পাশে নিঃশব্দে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে, লক্ষ্যই করেনি।

নাও বাবা, উঠে পড়।

মোহন দেখল, লোকটা একহাতে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

মোহন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব?

গরীবের কুঁড়েঘরে একটু বিশ্রাম করবে। অসুখটা সেরে গেলে তোমার বাবার হাতে তোমায় তুলে দিয়ে আসব। দেশ কোথায় তোমার?

দেবীগড়।

অ, বর্ধমান জেলায়। আমি গেছি তোমাদের গাঁয়ে। নাও বাবা উঠে পড়, আর দেরি করো না।

মোহন উঠে পড়ল। লোকটি উঠে মোহনের পাশে বসল। বসে নিজের গায়ের গরদের চাদর খুলে মোহনের গায়ে জড়িয়ে দিল।

বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে। এটা জড়ানো থাক।

মোহন আড়চোখে চেয়ে দেখল, লোকটার গলায় ধবধবে সাদা পৈতে। ডান হাতে সোনার তাবিজ।

প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক। অনেক গলি, উপগলি পার হয়ে ট্যাক্সি একটা বাড়ির সামনে এসে থামল।

বিরাট বাড়ি, কিন্তু জরাজীর্ণ। কার্নিশে পায়রার ঝাঁক। বট-অশথের চারা বেরিয়েছে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লোকটি নামল। তারপর মোহনের হাত ধরে নামাল।

ট্যাক্সির শব্দ হতেই দারোয়ান গেট খুলে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি দারোয়ানের দিকে ফিরে বলল, দারোয়ানজী, এই

ছেলেটিকে দোতলায় নিয়ে যাও তো। এর শরীর খারাপ। শোবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি নীচে বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

যাবার সময় লোকটি মোহনের গা থেকে গরদের চাদরটা খুলে নিয়ে বলল, যাই বাবা, আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

বাড়ির তুলনায় সিঁড়ি খুব সরু। সরু আর অন্ধকার। এত অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও আলোর দরকার।

দারোয়ান মোহনের হাতটা শক্ত করে ধরে ওপরে উঠতে লাগল। প্রশস্ত দ্বিতল, কিন্তু জনশূন্য। পাশে সার সার কামরা। সামনের কামরার চাবি খুলে দারোয়ান মোহনকে তার মধ্যে ঢোকাল।

আশ্চর্য ঘর। একটাও জানলা নেই। অনেক উঁচুতে কেবল একটা ঘুলঘুলি। অন্ধকার চোখে সহ্য হয়ে যেতে মোহন দেখল, কোণের দিকে একটা খাটিয়া পাতা।

ওই খাটিয়ায় গিয়ে বসো, আমি তোমার জন্য বিছানা নিয়ে আসছি।

মোহন খাটিয়ার ওপর বসলে দারোয়ান চলে গেল। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মোহন খাটিয়ার ওপর বসে এদিক ওদিক দেখল। কামরাটা যেন জেলখানার মতন। দরজা বন্ধ হলে আর বের হবার পথ নেই।

একটু পরেই দারোয়ান ফিরল। কাঁধে বিছানা আর কম্বল। মোহন উঠে দাঁড়াতে খাটিয়ার ওপর বিছানা পেতে দিল। কম্বলটা মোহনকে গায়ে জড়াতে বলল।

এবার একটি প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকল।

ছোট একটা টুলের ওপর থালায় করে রুটি, তরকারি এনে রাখল। গ্লাসে দুধ। সামনে খাবার দেখে মোহনের তেষ্টাটা আবার জেগে উঠল।

আমাকে একটু জল দাও।

দারোয়ান চৌকাঠের কাছ বরাবর চলে গিয়েছিল। মোহনের

কথা শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ওকে অত আস্তে বললে শুনতেই পাবে না। ও বোবা আর কালা। যা বলবে খুব চেঁচিয়ে বলবে। আচ্ছা, আমিই বলছি।—যামিনীর মা, খোকাকে এক গ্লাস জল দাও।

প্রৌঢ়া হেসে বলল, ঝাল? তরকারি না খেয়ে ঝাল বুঝলে কি করে?

আরে কি মুশকিল, একেবারে বদ্ধ কালা।

দারোয়ান প্রৌঢ়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চেঁচিয়ে বলল, জল, জল, জল দাও এক গ্লাস।

এবার প্রৌঢ়া বুঝতে পারল, আনছি—বলে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই জল এনে রাখল।

মোহন খাওয়া শেষ করে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। এখনো শরীরে ব্যথা আছে। জ্বরটা একটু কম।

প্রৌঢ়া থালা-গ্লাস নিয়ে যেতেই দারোয়ান বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্লান্তিতে মোহনের দু'চোখে ঘুম নেমে এল।

অনেকক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দে মোহন উঠে বসল।

ঘরের মধ্যে এত অন্ধকার, দিন কি রাত বোঝা মুশকিল। দেখল, বিরাট চেহারার একটা লোক ঘরে ঢুকছে। হাতে ছোট একটা ব্যাগ। খাটিয়ার এক পাশে লোকটা বসে বলল, দেখি, জামাটা তোল, বুক পিঠ দেখব।

মোহন জামাটা তুলল।

হাতের টর্চ জ্বেলে লোকটা মোহনের পিঠের দিকে দেখেই বলল, ইস, অনেকগুলো কালসিটের দাগ যে। পেটালে কে?

খুব আস্তে মোহন উত্তর দিল, বাবা।

বাবা? কি করেছিলে? লোকটার কণ্ঠস্বর যেন বাজের মতন।

তারই টর্চের আলোয় দেখা গেল লোকটার রং কুচকুচে কালো। মুখচোখের চেহারা অনেকটা গরিলার মতন। খোঁচা খোঁচা চুল।

লোকটার কথায় মোহন কোন উত্তর দিল না।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে লোকটা মোহনকে পরীক্ষা করল, তারপর ব্যাগ খুলে গোটা ছয়েক সবুজ রংয়ের বড়ি বের করে দিয়ে বলল, খাবার পর আর শোবার আগে একটা করে বড়ি খাবে। আজ আর কাল। কাল এমনই সময়ে আবার আমি আসব। বলে ব্যাগ বন্ধ করে লোকটা উঠে পড়ল।

তারপর রাতের খাওয়া যামিনীর মা-ই নিয়ে এল। কলাইয়ের বাটিতে ভাত, ডাল আর আলু ভাজা।

মোহন যখন খাচ্ছে, তখন যামিনীর মা ইশারায় দেখাল। পাশেই কলঘর আছে। দরকার হলে যেতে পারে।

যামিনীর মা চলে গেল।

বাথরুমে ঢুকে মোহন দেখল চৌবাচ্চায় জল রয়েছে। একটা মগ। কোন কল নেই।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মোহন ভাবল, কি আশ্চর্য, গরদ পরা লোকটা, যে মোহনকে হাওড়া স্টেশন থেকে এখানে এনে তুলল, সে তো সারা দিনের মধ্যে একবারও দেখা করতে এল না।

এটা কাদের বাড়ি? খেতে দিচ্ছে, ডাক্তার আসছে, সবই হচ্ছে, কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা কেমন দয়ামায়াশূন্য। রুক্ষ ব্যবহার, কঠোর কণ্ঠস্বর। ডাক্তারেরও যেন মমতার বালাই নেই।

রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। ক'টা বেজেছে জানবার উপায় নেই। ঠিক পাশের ঘর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। চাপা গলায় কে কাঁদছে। মাঝে মাঝে ভারী গলায় ধমকের আওয়াজ।

মোহন বিছানার ওপর উঠে বসল। দেয়ালে কান পেতে শুনল। যে কাঁদছে তার যেন খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণার জন্য মুখ ফুটে ভাল করে কাঁদতেও পারছে না। মোহনের মনে হলো, এটা কি হাসপাতাল! রোগের যন্ত্রণায় হয়তো কেউ চেঁচাচ্ছে। ডাক্তার ধমকে থামাবার চেষ্টা করছে।

পরের দিন সকালে দারোয়ান দরজা খুলে দিল। যামিনীর মা

ঘরে ঢুকে এঁটো থালা তুলে নিতে এল।

যামিনীর মাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, তাই মোহন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, রাতে কে কাঁদছিল?

দারোয়ান ভ্রূ কোঁচকাল, কাঁদছিল? কোথায়?

পাশের ঘরে বলেই মনে হলো।

দারোয়ান কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, ও পাশের ঘরে একটা পাগল আছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে। উত্তর দিয়ে দারোয়ান আর দাঁড়াল না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

মোহন ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরল। ছোট সাইজের ঘর। কতদিন তাকে এভাবে থাকতে হবে কে জানে? বাড়িতে এতক্ষণে নিশ্চয় হুলস্থুল পড়ে গেছে। রাত্রেই বাবা বেরিয়ে পড়েছে গাঁয়ের চেনা-জানা বাড়িতে। মোহনের বন্ধুদের বাড়ি। মোহনের খোঁজে। তারপর এক সময় হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

মোহনের ভাবনা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার দরজা খুলে গেল। এবার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল বেঁটে একটি লোক। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। পরনে গেঞ্জী আর লুঙ্গী। শক্ত সমর্থ চেহারা। লোকটা বলল, কি নাম রে তোর ছোকরা? যেমন কথার ভঙ্গী, তেমনই কর্কশ কণ্ঠ।

মোহন ভয়ে ভয়ে বলল, মোহন সরকার।

বাপের নাম কি?

অভয় সরকার।

হুঁ, কি করে?

দোকান আছে। কাপড়ের দোকান।

কাপড়ের দোকানের মালিক? তা হলে দু' পয়সা আছে। তা বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন?

মোহন কেন পালিয়েছে তা বলল, সব শেষে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাল, গরদ পরা লোকটি বলেছিল যে, আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। এখন আমি অনেকটা ভাল আছি, এবার আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।

গরদ পরা লোক? ঠাকুরমশাই? কথা শেষ করে লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর এক সময়ে হাসি থামিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাব বৈ কি। এই বাজারে তোকে অমনি অমনি দিনের পর দিন পুষব নাকি! তোদের দেশের ঠিকানাটা কি?

মোহন ঠিকানা বলল।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে, তোর বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এসে তোকে নিয়ে যাবে।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই যামিনীর মা ঢুকল। একটা মগে চা আর থালায় হু'খানা আধপোড়া রুটি।

মোহন যখন খাচ্ছে, তখনই যামিনীর মা ঘরটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর খাওয়া হতেই মগ আর থালা নিয়ে চলে গেল।

মোহন আবার পায়চারি শুরু করল। পায়চারি করতে করতেই থেমে গেল। বাথরুমের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক দেখল। এপাশে একটা জানলা আছে, কিন্তু সে জানলা খোলবার উপায় নেই। পেরেক দিয়ে বন্ধ কবা।

জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর রেখা এসে বাথরুমে পড়েছে। মোহন বাথরুমের দরজা বন্ধ কবে সেই ফাঁকে চোখ রাখল। উঠোনের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় সার দিয়ে অনেকে দাঁড়িয়েছে। প্রায় মোহনেরই বয়সী, কিন্তু কেউই পূর্ণাঙ্গ নয়—কেউ মুলো, কেউ খোঁড়া, কেউ অন্ধ, কারো কোমর ভাঙ্গা, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকালের লুঙ্গী পরা বেঁটে লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলছে।

এতগুলো পঙ্গু ছেলে এখানে জড় হয়েছে কেন? সবাই কি এখানে থাকে? এটা তাদের আস্তানা! এখান থেকে সবাই ভিক্ষা করতে বের হয়? আসবার সময় স্টেশনে, গঙ্গার ধারে সামনে বাটি সাজিয়ে অনেক ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখেছে।

জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মোহন চুপচাপ দাঁড়াল। সব ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে।

দিন পাঁচ-ছয় একভাবে কাটল।

প্রত্যেক দিনই মোহন আশা করে, তার বাবা তাকে নিতে আসবে। দরজা খোলার শব্দ হলেই উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। কিন্তু না, কেউ এল না।

পরনের শার্ট প্যান্ট ময়লা হয়ে গিয়েছে। শার্টটা নিজেই কেচে নিয়েছিল। কিন্তু আবার নোংরা হয়েছে।

সাতদিন পর আবার সেই বেঁটে লোকটা এসে ঘরে ঢুকল। এবার উগ্রমূর্তি। দুটো চোখ লাল। সে বলল,-কি রে, বাবার নাম-ঠিকানা ঠিক দিয়েছিলি তো?

উত্তর দেবে কি, মোহন প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না!

উত্তর দিচ্ছিস না যে? লোকটা ধমক দিয়ে উঠল।

কাঁদো কাঁদো গলায় মোহন বলল, মিথ্যা নাম-ঠিকানা দিতে যাব কেন? বাবার নাম কেউ মিথ্যা বলে?

তা হলে তোর বাবা উত্তর দিলে না কেন? একেবারে যে চুপচাপ।

এ কথার মোহন কি উত্তর দেবে! সে মাথা নীচু করে রইল। তাহলে কি বাবার মোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই? তা যদি হয়, তাহলে কি করবে মোহন? এরা আর কতদিন খাওয়াবে? একদিন দরজা খুলে রাস্তায় বের করে দেবে নিশ্চয়ই। তখন মোহন কোথায় যাবে? পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?

লিখতে জানিস? লোকটা আবার গর্জন করে উঠল।

মোহনের রীতিমত অপমান বোধ হলো। সে বলল, কেন জানব না? ইংরেজী বাংলা দু-ই লিখতে জানি। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হই।

বাবাকে ইংরেজীতে চিঠি লিখতে হবে না। বাংলাই যথেষ্ট। নে, যা বলছি লেখ। লোকটা একটা কাগজ এগিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাউন্টেনপেন।

মোহন ভাবল, এ একরকম ভালই হলো। নিজের কথা বাবাকে সে নিজেই লিখবে। তা হলে নিশ্চয় বাবার মন গলবে।

কাগজ-কলম নিয়ে সে বলল, ঠিক আছে, আমি লিখে রাখছি।

লোকটা চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল ; ফাজলামি করিসনি। যা বলে দেবো, ঠিক তাই লিখবি। একটু এদিক-ওদিক হলে এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।

মোহন আর কথা বলল না। কলম ধরে চুপচাপ বসল।

লোকটা বলল, বাবাকে কি বলিস ? বাবা, না আজকালকার ঢংয়ে বাপী ?

মোহন বলল; বাবা।

তবে লেখ।—

বাবা, পত্রপাঠ মাত্র তুমি নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে দাঁড়ানো লোকটির হাতে দেবে, তা না হলে আমাকে জীবন্ত দেখতে পাবে না। এ চিঠির তারিখ থেকে পনরো দিন পর্যন্ত এরা অপেক্ষা করবে, তার পর যা করার করবে। যদি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ কর, তাহলে কি ফল হবে আশা করি বুঝতে পারবে। ইতি তোমার আদরের মোহন।

হাতটা থর থর করে কাঁপছে। ঢিপ ঢিপ করছে বুক। তবু থেমে থেমে মোহন সবটা লিখল।

সে ভাবলে, ছেলেধরার খপ্পরে পড়েছে নিশ্চয়। গরদ পরা লোকটা বোধহয় এদেরই চর।

লেখা শেষ হতে লোকটা কাগজটা ছিনিয়ে নিল—কি লিখেছিস দেখি। কাগজটা চোখের সামনে ধরে বলল, হাতের লেখাটা তো ভালই দেখছি। আমার পেটে বোমা মারলেও একটি অক্ষর বের হবে না, কাজেই পড়বার চেষ্টা করে লাভ নেই। কালুবাবুকে দিয়ে পড়িয়ে নেব। যদি দেখি একটু এদিক-ওদিক লিখেছিস, তাহলে দেয়ালে মাথা ঠুকে একেবারে ঘিলু বের করে দেবো। মনে থাকে যেন।

মোহন কোন কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল। এতদিন বিশেষ ভয় পায়নি। ভেবেছিল, এরা সত্যিই হয়তো বাবার হাতে

একদিন তুলে দেবে। এভাবে বাড়ি থেকে চলে আসার জন্য ধমক কিংবা দু'একটা চড়-চাপড়, তার বেশী কিছু নয়। ঘরের ছেলে ঘরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে।

পাঁচ হাজার টাকা তো অনেক টাকা। অত টাকা বাবার আছে কি না মোহনের জানা নেই। থাকলেই যে মোহনের জন্য অত টাকা বের করে দেবে, এমন সম্ভাবনা কম।

যদি টাকা না আসে, তাহলে এরা মোহনকে খতম করে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকটা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই মোহন বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

লোকটার কানে বোধহয় কান্নার আওয়াজ গিয়ে থাকবে। সে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। সে বলল, কি রে, কান্না হচ্ছে কেন? দেবো গলাটা টিপে, জন্মের শোধ কান্না বন্ধ করে?

মোহন থেমে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, বড্ড পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে।

হোক, শুয়ে থাক মুখ বুজে। নবাবপুত্তুরের একটা না একটা লেগেই আছে। যামিনীর মাকে বলে দিচ্ছি রাত্রে কিছু খেতে না দেয়। উপোস করলেই সব অসুখ সেরে যাবে।

দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

মোহন বাথরুমের জানলায় আবার চোখ রাখল। উঠোন খালি। কেউ নেই। মোহন চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। না, কাছাকাছি কোন গাছ নেই। অনেক কাহিনীতে মোহন পড়েছে, ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক ছেলে জানলা ভেঙ্গে কাছাকাছি গাছের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। তারপর ডাল ধরে ধরে নেমে—দে ছুট।

কিন্তু এখানে তা হবার উপায় নেই। গাছ তো নেইই, আবার জানলায় গরাদ। লোহার গরাদ ভাঙ্গবার সাধ্য মোহনের নেই।

মোহন বিছানায় ফিরে এল।

আজ সমস্ত দিন খাওয়া বন্ধ। সেই একবার সকালে চা আর রুটি খেয়েছে। আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না। তবু মোহন স্নান সেরে নিল। তারপর খালি গায়ে প্যান্ট পরে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। মোহনের চেয়ে একটু বড় একটা ছেলে ভাত, তরকারি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আনন্দে মোহন চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিল। যাক, উপোস করে কাটাতে হবে না। লোকটা শুধু ভয় দেখাচ্ছিল।

টুলের ওপর থালা-বাটি নামিয়ে রাখতে মোহন জিজ্ঞাসা করল, যামিনীর মায়েব কি হলো ?

মা'র অসুখ করেছে।

মা ? তুমি তাহলে কে ?

আমি যামিনী। নাও, খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখলে বাবুরা রাগ করবে। আমি পরে এসে বাসন নিয়ে যাব।

যামিনী সন্ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

ঝি নারকেলপাতা চিরে চিরে ঝাঁটা তৈরি করছে, সৎমা লীলা দাওয়ায় বসে তারই তদারক করছিল।

আজ ক'দিন মোহন নিখোঁজ। জলজ্যান্ত ছেলেটা কোথায় গেল, এটাই আশ্চর্য। লীলার ধারণা ছিল, রাত হলেই ঠিক গুট-গুট করে বাড়ি এসে পৌছবে। কিন্তু কত রাত কেটে গেল, ছেলেটার দেখা নেই।

অবশ্য মোহনের জন্য লীলার মায়া-মমতা মোটেই নেই। ইদানীং ছেলেটা বেশ বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। পাছে বাড়ির কাজ করতে হয়, তার জন্য স্কুল ফেরত টো টো করে এদিক-ওদিক কাটিয়ে আসত।

কতদিন বাবা বলেছে, আহা, ওকে দিয়ে কাজ করাও কেন? স্কুলের পড়ুয়া, লেখাপড়া আছে। কাজ করার জন্য তোমার তো আলাদা লোক আছে।

লীলা তেড়ে উঠেছে। আদর দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে মাথায় তুলেছ। কি এমন কাজ করাই। সব রকম কাজ শিখে রাখা দরকার। বলা যায় কি, মানুষের জীবনে কখন কি রকম সময় আসে!

মোহনের বাবা আর কথা বলেনি। চুপ করে থেকেছে।

একথা লীলা খুবই জানে, মনে মনে মোহনের বাবা মোহনকে খুবই ভালবাসে।

তবে সেদিন সন্ধ্যায় মারের বহর দেখে লীলাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লীলা ভেবেছিল, বড়জোর কানটা মলে দেবে, কিংবা পিঠে একটা চড়। কিন্তু মোহনের বাবা যে অমন নির্মমভাবে মারবে, তা ভাবতেও পারেনি।

অবশ্য কারণটা পরে বুঝতে পেরেছে। সেদিন দোকানে বেশ লোকসান গিয়েছিল। একদল খদ্দের কিভাবে চোখে ধুলো দিয়ে খানকয়েক কাপড় সরিয়ে ফেলেছিল, কেউ বুঝতেও পারেনি। দোকান বন্ধ করার আগে হিসাব মেলাবার সময় লোকসান ধরা পড়েছিল। কাজেই মেজাজ খুব খারাপ হয়েই ছিল। তারপর বাড়িতে ঢুকতেই হলধর মালী আর লীলার অভিযোগ কানে যেতেই নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। খেপে গিয়েছিল।

যাই হোক, পরের দিনই মোহনের বাবা খবর এনেছিল। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছিল। পরের দিন স্কুলে যেতেই পল্টু আর শিবে সব স্বীকার করেছিল।

মোহনের হারিয়ে যাওয়াব কথা শুনে তারা মোহনের বাবার কাছে বলেছিল, মোহন তো মালীকে ঢিল ছুঁড়ে মারেনি, মেরেছে শিবে। মোহন দূরে দাঁড়িয়েছিল। মালী মিথ্যা কথা বলেছে।

মোহনের বাবা হলধরের কাছেও গিয়েছিল। আমতা আমতা করে সে বলেছে, ঠিক বুঝতে পারিনি বাবু। দু'জনের গায়েই সবুজ জামা ছিল। এখন মনে হচ্ছে, মোহনদাদাবাবু দূরে গাছের তলায় যেন দাঁড়িয়েছিল।

ছি, ছি, ছি, মোহনের বাবার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করল। ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়ে ছেলেটাকে এভাবে মারা খুবই অন্যায় হয়েছে। ছেলেটা কি দুঃখে আত্মহত্যা করল? মা-মরা ছেলের অভিমান একটু বেশীই হয়।

কথাগুলো লীলাকে বলতে সে কিন্তু মানতে চাইল না। সে বলেছে, না হয় ঢিলই ছোঁড়েনি, কিন্তু ওসব খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতেই বা গিয়েছিল কেন? তুমি অত ভাবছ কেন? কোথায় যাবে? দেখো গুটগুট করে ঠিক এসে হাজির হবে।

মোহনের বাবা কোন উত্তর দেয়নি। গুম হয়ে বসেছিল। লীলা আর কথা বাড়ায়নি। সে ঠিক জানত, কয়েকদিন এখানে-ওখানে কাটিয়ে মোহন বাড়িতে ফিরে আসবে।

লীলা দাওয়ায় বসে থেকেই হঠাৎ দেখল, উঠানের বাইরে

গাঁয়ের পিয়ন দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সে বলল, মা চিঠি।

উঠানে ঝাঁটার কাঠি ছড়ানো বলে পিয়ন আর এগলো না।

লীলা বলল, বিন্দুর মা, চিঠিটা নিয়ে এস তো।

এ বাড়িতে কালেভদ্রে চিঠি আসে। যা আসে লীলার বাপের বাড়ি থেকেই।

লীলা হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে খুলল। কয়েক লাইন পড়েই ভ্রূ কোঁচকালো। চিঠির কোণে মড়ার খুলির ছাপ। কোন ঠিকানা নেই। তলায় কোন নাম নয়।

চিঠিতে লেখা : আপনার ছেলে মোহন আমাদের আশ্রয়ে আছে। আপনি যদি তাকে ফেরত চান, তাহলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে সামনের মঙ্গলবার বেলা দুটো থেকে চারটের মধ্যে আসবেন। ইতি—তলায় কোন নাম নেই।

পাঁচ হাজার টাকা !

লীলার মনে হলো, এ চিঠি মোহনই কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করার ফন্দি। বারো-তেরো বছরের ছেলের পেটে পেটে কি শয়তানী বুদ্ধি! কিন্তু ছেলেটা কলকাতায় গেলই বা কি করে? এখান থেকে কলকাতা যাবার ভাড়া পেল কোথা থেকে !

লীলার মুখচোখের ভঙ্গী দেখে বিন্দুর মা জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ নতুন মা, বাপের বাড়ির খবর সব ভাল তো ?

লীলা সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, মোটামুটি ভালই আছে সব।

চিঠি হাতে করে লীলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর তক্তপোশের ওপর বসে ভাবতে লাগল। এ চিঠিটা মোহনের বাবাকে দেওয়া উচিত হবে না। মানুষটার মতিগতির কোন ঠিক নেই। হয়তো টাকাটা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়েই হাজির হবে। পাঁচ হাজার বড় কম নয়! একটা বদমাশ ছেলের পিছনে এত টাকা ঢালার কোন মানে হয় না।

লীলা চিঠিটা নিয়ে খিড়কি-পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

এদিক-ওদিক দেখে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কচুগাছের মধ্যে ফেলে দিল। নিশ্চিন্ত, আর কোন ভয় নেই। মোহনের বাবা কিছু জানতেও পারবে না।

রাত্রে মোহনের বাবা ফিরে হাতপাখা নিয়ে দাওয়ায় বসল। গুমোট গরম। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

লীলা পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, আজ ফিরতে যে এত রাত হলো ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহনের বাবা বলল, থানায় একবার খোঁজ নিয়ে এলাম। সেখানেও তো কোন খবর নেই।

সেখানে আবার কি খবর পাবে ?

যদি পুকুরেও ডুবে গিয়ে থাকে, তা হলে তো লাশ ভেসে উঠবে।

তুমিও যেমন ! মোহন খুব ভাল সাঁতার জানে। খিড়কি-পুকুর কতবার এপার-ওপার করত। জলে ডুবতে পারে না।

যদি বাসের তলায় চাপা পড়ে থাকে। দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায় ! আমার মন বলছে, মোহন আর নেই। বলতে বলতে শেষদিকে মোহনের বাবার গলার স্বর ভেঙ্গে গেল। কাপড়ে দু'চোখ মুছে বসে রইল চুপচাপ।

লীলা উঠে দাঁড়াল। ছেলের শোকে লোকটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। একবার যদি চিঠির কথা জানতে পারে, তাহলে এখনই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হবে। তার চেয়ে ক'দিন কেটে গেলে মোহন যখন বুঝতে পারবে যে, টাকা নিয়ে বাবা আসবে না, তখন সুড় সুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। ঠিক জব্দ হবে।

দিন কয়েক পর মোহনের বাবা দোকানে বসেছিল, হঠাৎ একটা ভিখারি এসে দাঁড়াল। বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা। দু'দিন কিছু খাইনি।

মোহনের বাবা কর্মচারীর দিকে ফিরে বলল, ওকে দশটা পয়সা দিয়ে দাও তো।

কর্মচারী দশটা পয়সা নিয়ে ভিখারির দিকে এগিয়ে দিল। ভিখারি তখন একটা মুখ-আঁটা খাম কর্মচারীর হাতে দিয়ে বলল, এটা মালিককে দিয়ে দিন।

কর্মচারী অবাক। খামটা মোহনের বাবার সামনে ফেলে দিয়ে কর্মচারী বলল, আপনার চিঠি।

আমার? ক্ষিপ্রহাতে মোহনের বাবা খামটা খুলল। গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ল। পড়েই গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি মোহনের বাবা বের হয়ে গেল।

ভিখারিটা ততক্ষণে খালের ধারে বাবলা গাছের তলায় গিয়ে বসেছিল, মোহনের বাবা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

খেয়াঘাটে বসেছিলাম, এক বুড়োবাবু হাতে দিয়ে বলল, এই চিঠিটা ওই দোকানের মালিককে দিয়ে এস।

বুড়োবাবু? এ গাঁয়ের?

এ গাঁয়ে তো কখনো দেখিনি। বুড়োবাবু খেয়ানৌকায় উঠে চলে গেল।

হুঁ। মোহনের বাবা আবার দোকানে ফিরে এল।

সব ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। মোহন তাহলে বদমাশ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ধারধোর করে পাঁচ হাজার টাকা হয়তো যোগাড় করা যায়, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা দিলেই যে মোহনকে ফিরে পাওয়া যাবে, তার কি স্থিরতা! লোভের কি শেষ আছে? আরো হয়তো টাকা চেয়ে বসবে। থানায় গিয়ে পুলিশকে চিঠিটা দেখালে হয়, কিন্তু তার ফল যে ভাল হবে না, সে কথা চিঠিতে লেখাই আছে।

মোহনের বাবা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিল। চিঠিতে কি লেখা আছে, কাউকে কিছু জানাল না। শুধু বলল যে, শরীরটা খারাপ। পথে বেরিয়ে সে ভাবল, জমিদার বাড়ির মেজবাবুর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখলে হয়। ছেলেবেলায় একসঙ্গে তারা খেলাধুলা করেছে। সে কলকাতায় বড় চাকরি করে। খুব বুদ্ধিমান।

গতকালও দোকানে আসবার সময় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। নিজের আমবাগানে দাঁড়িয়ে গাছের তদারক করছিল। তখন বলেছিল যে, দিন পনরো গাঁয়ে থাকবে।

মোহনের বাবা জমিদার বাড়ির দিকে সাইকেল ঘোরাল। ভাগ্য ভাল। মেজবাবু বাড়িতেই ছিল। নীচের ঘরে বসে হ্যাজাকের আলোয় বই পড়ছিল। মোহনের বাবাকে দেখে বলল, মোহন তো ভারি ভাল ছেলে। হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার মতন তো নয়। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

মোহনের সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

তাই নাকি? বলো, কি পরামর্শ। মেজবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

মোহনের বাবা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও। কথাটা খুবই গোপনীয়।

মেজবাবু রীতিমত আশ্চর্য হলো। চেঁচিয়ে বলল, ওরে, এখানে কে আছিস, দরজাটা বন্ধ করে দে। কেউ এলে ঢুকতে দিসনি। অপেক্ষা করতে বলবি।

দরজা বন্ধ হলো।

মোহনের বাবা পকেট থেকে চিঠিটা বের করে মেজবাবুকে দিল, পড়ে দেখ।

একবার, দু'বার, তিনবার পড়ল মেজবাবু। তারপর বলল, খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হবে। একটু ভুল হলেই মোহনকে তুমি আর জীবন্ত পাবে না। এদের কোনরকম দয়ামায়া নেই।

মোহনের বাবা বলল, তাহলে উপায়?

এক উপায় আছে। পারিজাত বক্সির কাছে একটা চিঠি দিতে পারি। ভদ্রলোক আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করো।

পারিজাত বক্সি। তিনি কে?

বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সির নাম শুনেছ তো?

তোমার কাছেই তাঁর অনেক গল্প শুনেছি।

তিনি আর নেই। পারিজাত বক্সি তাঁরই ভাইপো। এর মধ্যেই ভদ্রলোক খুব নাম করেছেন। চিঠিটা নিয়ে তাঁকে দেখাও। তিনি যদি কেসটা হাতে নেন, তাহলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

মোহনের বাবা বলল, কিন্তু এরা যে লিখেছে চিঠি পাবার পনরো দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি দেরি হয়ে যায়?

মেজবাবু মাথা নাড়ল, না না, এত তাড়াতাড়ি ওরা কিছু করবে না। এতগুলো টাকার ব্যাপার। নিশ্চয় বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করবে।

তাহলে তুমি চিঠিই একটা লিখে দাও, আমি গিয়ে দেখা করি ভদ্রলোকের ফি কত?

কাজ শেষ হলে ফি। এখন কিছু দিতে হবে না।

মেজবাবু দাঁড়িয়ে উঠে আলমারি থেকে চিঠির কাগজ আর কলম বের করল। চিঠি লিখে খামে এঁটে মোহনের বাবার হাতে দিয়ে বলল, শ্যামবাজারে রতন সিকদার লেন। ঢুকেই বাঁ-হাতি লাল বাড়ি। চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। তিনি কী বলেন, এসে আমাকে জানিও।

॥ তিন ॥

চিঠি নিয়ে মোহনের বাবা উঠে পড়ল। মনে মনে ঠিক করে নিল, লীলাকে একটি কথাও বলবে না। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। কোথা থেকে কার কানে উঠে যাবে, তারপর বিপদ ঘটবে।

লীলাকে বলল যে, মাসে একবার যেমন কলকাতায় কাপড়ের গাঁট কিনতে যায়, তেমনই যাচ্ছে।

হাওড়া থেকে সোজা শ্যামবাজারের বাসে চড়ল। যথাস্থানে পৌঁছে পারিজাত বক্‌সির বাড়ি খুঁজে নিতেও মোটেই অসুবিধা হলো না।

একটি চাকর তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে খবর দিতে গেল।

একটু পরেই ভিতর থেকে এক থুড়থুড়ে বুড়ো এসে দাঁড়ালেন। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছেন। একটা চোখ কালো কাঁচে ঢাকা। বোধ হয় ছানির জন্য সবে চোখ কাটানো হয়েছে। বুক পর্যন্ত ধবধবে সাদা দাড়ি। পরনে চীনে কোট আর ধুতি। বললেন, কী চান বলুন, আমিই পারিজাত বক্‌সি।

মোহনের বাবা হতাশ হলো। সর্বনাশ, এ তো বুড়ো লোক, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। এত বয়সের লোক বদমাশদের কবল থেকে মোহনকে উদ্ধার করে আনবে, তাও কি সম্ভব?

মোহনের বাবা পকেট থেকে দু'খানা চিঠি—একখানা মেজবাবুর, আর একখানা মোহনের, পারিজাত বক্‌সির হাতে তুলে দিল।

অনেকটা সময় নিয়ে তিনি চিঠি দুটো পড়লেন, বিশেষ করে মোহনের লেখা চিঠি। তারপর মোহনের বাবার দিকে ফিরে

বললেন, এটা আপনার ছেলের হাতের লেখা তো ঠিক ?

মোহনের বাবা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

চিঠিটা থাক আমার কাছে। আপনার বন্ধুকে বলবেন যে, কেসটা আমি হাতে নিলাম। এ চিঠিটা আপনি পেলেন কার কাছ থেকে ?

এক ভিখারি দোকানে দিয়ে গেল। সে বলল, খেয়াঘাটে এক বুড়ো নাকি তার হাতে দিয়ে গেছে। আমি আর খোঁজ করিনি।

ভালই করেছেন। খোঁজ করলে হয়তো শুনতেন, বুড়োকে এক মাঝি দিয়েছে, মাঝিকে দিয়েছে এক কারখানার মজুর। মজুরকে দিয়েছে হাটের ডিমওয়ালা। এ চক্রের শেষ পেতেন না।

মোহনের বাবা উঠে দাঁড়াল। যাবার মুখে প্রশ্ন করল, মোহনকে আবার ফিরে পাব তো ?

আশা তো করছি, তবে জোর করে কিছু বলতে পারছি না। কাল থেকেই আমি কাজে লাগব। আপনি দিন দশেক পরে মঙ্গলবার একবার খবর নেবেন। এ বাড়িতে নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে সন্ধ্যা সাতটার সময়।

মোহনের বাবা বেরিয়ে এল।

পকেটের মধ্যে হাজার পাঁচেক টাকা এনেছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখেছিল। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘড়ির নীচে বিশেষ করে। তার ধারণা, মোহনের হাত ধরে কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়াবে। তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিলেই সে মোহনকে ফেরত দেবে। কিন্তু সেরকম কেউ এগিয়ে আসেনি।

গাঁয়ে ফিরে মোহনের বাবা মেজবাবুকে সব জানাল। তার সন্দেহের কথাও। পারিজাত বক্‌সি অত বুড়ো লোক, তাঁর দ্বারা কিছু কাজ হবে, এমন সম্ভাবনা কম।

মেজবাবু হেসে উঠল, পারিজাত বক্‌সি বুড়ো হতে যাবে কেন ? একেবারে জোয়ান। বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল, তাই বুঝতে পারনি। তাঁর বয়স বছর ত্রিশের বেশী নয়।

মোহনের বাবা অবাক। অমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরা কি সম্ভব!

যাই হোক, মোহনের বাবা দোকানে বসে বটে, কিন্তু খুব অন্যমনস্ক। বিক্রির দিকে একেবারে মন নেই। কেবল মোহনের কথা ভাবে। ছেলেধরাদের কথা কিছু বলা যায়! হয়তো মোহনকে মেরেই ফেলবে। মেরে ফেলে মোহনের বাবাকে মোহনের মাথাটা পার্শেল করে পাঠাবে, গোয়েন্দা কাহিনীতে যেমন পড়া যায়।

দশ দিন কাটতেই এক মঙ্গলবার মোহনের বাবা কলকাতায় এসে হাজির হলো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে যখন পৌঁছাল, তখন সাতটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

অনেক লোক ময়দানে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পারিজাত বক্সিকে দেখা গেল না।

মোহনের বাবা মনে মনে বিরক্ত হয়ে গেল। যার কথার ঠিক নেই, এত বড় কাজের ভার তার ওপর দেওয়াই উচিত হয়নি।

সাতটা কুড়ি। মোহনের বাবা কি করবে যখন ভাবছে, তখন রাস্তা পার হয়ে একজন কাবুলি সামনে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার বাংলায় বলল, কিছু মনে করবেন না। আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

আপনি?

কাবুলি হাসল, যার এখানে অপেক্ষা করার কথা ছিল, আমি সেই পারিজাত বক্সি। চলুন, ওদিকটা একটু নির্জন আছে। ওই গির্জার বাগানে বসে কথাবার্তা বলি।

দু'জনে গির্জার বাগানে গিয়ে বসল।

পারিজাত বক্সি বললেন, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে মোহনের একটা ফটো আনতে বললে ভাল হতো, তাকে চেনবার পক্ষে আমার সুবিধা হতো।

মোহনের বাবা পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরল।

আমার বড় ভয় হচ্ছে। মোহনকে হয়তো মেরেই ফেলবে। দশ দিন কেটে গেছে, আর মাত্র পাঁচদিন বাকি।

অবশ্য এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপনার ছেলেকে মেরে ফেলে ওদের বিশেষ লাভ হবে না, যা করবে তা হয়তো মেরে ফেলার চেয়েও সাংঘাতিক।

সেকি ?

এ শহরে গোটা কয়েক দল আছে যারা ছোট ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে অন্ধ, খোঁড়া কিংবা অন্য কোন রকমভাবে বিকলাঙ্গ করে দেয়। তারপর তাদের দিয়ে পয়সা রোজগার করে। অবশ্য ওরা যথেষ্ট চালাক। এক প্রদেশের ছেলেকে অন্য প্রদেশে চালান দেয়। আপনার ছেলেকে হয়তো কানপুর কিংবা কাশীতে পাঠিয়ে দেবে, যাতে চট করে ধরা না পড়তে পারে।

তাহলে উপায় ?

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এরকম গোটা তিনেক দলের ওপর নজর রেখেছি। পুলিশ-স্টেশনেও খবর দেওয়া আছে। আপনি শুধু মোহনের একটা ফটো আমায় পাঠিয়ে দেবেন।

কোথায় পাঠাব বলুন ?

আপনি হাওড়া রেলওয়ে পুলিশের কাছে আমার নাম লিখে জমা করে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।

মোহনের বাবা উঠে পড়ল। ট্রেনে বসে ভাবতে লাগল, সব যেন ধীর গতিতে চলেছে। মোহনকে ফিরে পাবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষ এত নির্মম হতে পারে, ভাবাই যায় না। একটা জলজ্যান্ত ছেলের দুটো চোখ কি করে নষ্ট করে দেয়, কিংবা হাত বা পা ভেঙে তাকে বিকলাঙ্গ করে ফেলে, মোহনের বাবা ভেবেই উঠতে পারল না। এইসব বদমাশদের কি নিজেদের ছেলেপুলে নেই ?

ট্রেন একটা স্টেশনে থামতে একটা নুলো ছেলে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা পয়সা দিন বড়বাবু। সকাল থেকে না খেয়ে আছি।

অন্যদিন হলে মোহনের বাবা মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু এবার ভাল করে ছেলেটাকে দেখল। কিছু বলা যায় না, এ হয়তো আর-এক মোহন। বদমাশ লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে এভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে।

পকেট থেকে পঞ্চাশ পয়সা বের করে ছেলেটার হাতে দিল মোহনের বাবা।

তারপর গ্রামে ফিরে বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েই তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

জ্যোৎস্না রাত। চারদিক দিনের আলোর মতন পরিষ্কার।

বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা বট গাছ। তার নীচু ডালে সাদা মতন কি একটা বাতাসে দুলছে। মোহনের বাবা কাগজটা খুলে নিল। তাতে লেখা: সাবধান। পারিজাত বক্‌সির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনছ।

এদিক ওদিক দেখে মোহনের বাবা কাগজটা পকেটের মধ্যে রেখে দিল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই লীলার সঙ্গে দেখা।

মোহনের বাবা বলল, আচ্ছা, আমাদের বাড়ি কেউ এসেছিল?

হ্যাঁ, একজন এই কাগজটা দিয়ে গেছে।

মোহনের বাবা চমকে উঠল। আবার কিসের কাগজ? একটা কাগজ তো গাছের ডালে আটকে দিয়ে গেছে। সে বলল, কি কাগজ দেখি!

লীলা বলল, পলাশডাঙ্গার মাঠে যাত্রা হবে—তারই কাগজ। পরে দেখবে, এখন রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

সে রাত্রে মোহনের বাবা ঘুমোতে পারল না। এ-পাশ ও-পাশ করল।

পারিজাত বক্‌সির কাছে যাওয়া-আসা করছে, সে খবরও বদমাশদের কাছে পৌঁছে গেছে। তার মানে, এরা সাধারণ দল নয়। মোহনের বাবার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

পরের দিন মোহনের বাবা আলমারি খুলে একটা কাগজের ব্যাগ

বের করল। এর মধ্যে অনেক পুরোনো ফটো রাখা আছে। খুঁজতে খুঁজতে মোহনের একটা ফটো পাওয়া গেল। স্কুলে প্রাইজের সময় অন্য কয়েকজন ছেলের সঙ্গে তোলা। মোহনের বাবা কাঁচি দিয়ে মোহনের ছবিটা কেটে নিল। ভাগ্য ভাল, এই সময় লীলা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে। নইলে হাজার কৈফিয়ত দিতে হতো।

একটা খামে ফটো আর কাগজটা পুরে এবং সেইসঙ্গে নিজেও একটা চিঠি লিখে মোহনের বাবা খামের মুখটা ভাল করে আটকে নিল।

এর দিন দুই পরেই কলকাতা গিয়ে রেলওয়ে পুলিশের হাতে খামটা জমা দিল সে।

পুলিশ অফিসার বলল, আপনি একটু বসুন। পারিজাতবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকে বলেছেন, আপনি এলে তাঁকে ফোন করে দিতে।

মোহনের বাবা অপেক্ষা করল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর প্যাণ্ট-কোট পরা একটি ভদ্রলোক পাশে এসে বলল, এনেছেন খামটা ?

মোহনের বাবা ফিরে দেখল। টকটকে রং। কোঁকড়ানো চুল, মুখে পাইপ। এই কি পারিজাত বক্সির আসল চেহারা !

পুলিশ অফিসার খামটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই যে।

আসুন আমার সঙ্গে।

মোহনের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাইরে দাঁড়ানো একটা দামী মোটরে গিয়ে উঠল। তারপর চিঠিটা পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

মোহনের বাবা বলল, আপনার ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে।

হুঁ, তাই দেখছি। তবে আমিও চিনে গেছি ওদের। আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছি। প্রথম দিন বাড়িতে আসাটাই আপনার ভুল হয়েছিল। আপনাকে যে অনুসরণ করেছিল সে খোঁজ পেয়ে গেছে। আপনার আর আসবার দরকার নেই। দরকার হলে

আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। মনে রাখবেন, সর্বদাই আপনার পিছনে লোক আছে।

তাহলে আজও তো আপনাকে ওরা দেখে ফেলেছে?

তা দেখতে পারে, তবে আমি পারিজাত বক্‌সি নই।

তবে কে আপনি? মোহনের বাবা আঁতকে উঠল। তার ভয় হলো, বদমাশের দলের কেউ হয়তো ছলনা করে তাকে নিজের কব্জায় এনেছে।

আমি পারিজাত বক্‌সির সাগরেদ। নাম বললে চিনবেন না, কারণ আমি নামকরা লোক নই। পারিজাত বক্‌সি এই মুহূর্তে চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে বজরায়। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা, বদমাশদের দলকে তাই বোঝানো হয়েছে। তাদের আস্তানার দরজায় ভুল করে একটা চিঠি ফেলে রাখা হয়েছিল। তাতেই তারা চন্দননগর দৌড়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে আস্তানায় আপনার ছেলে নেই। সে হয়তো অন্য কোন দলের পাল্লায় পড়েছে।

॥ চার ॥

চারদিন কামাইয়ের পর সন্ধ্যাবেলা যামিনীর মা এল। তবু মোহন যামিনীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলত, যদিও যামিনী হ্যাঁ বা না ছাড়া কোন উত্তরই দিত না। এই বাড়ি বা বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে যামিনী একটি কথাও বলত না।

সন্ধ্যার সময় মোহনকে খেয়ে নিতে হতো। তার খাওয়া হলে দারোয়ান তালা দিয়ে চলে যেত।

সেদিন খাবার ব্যবস্থা দেখে মোহন অবাক হয়ে গেল। আধপোড়া রুটি নয়, ভাল ভাল চারখানা রুটি। সঙ্গে বেশ বড় সাইজের দু'খানা মাছ। আবার পেঁয়াজ কুচি।

মোহন বুঝতে পেরেছিল, তার বাবা আর তাকে উদ্ধার করতে আসবে না। পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলেও নতুন মা সেটা দিতে দেবে না। মোহন ফিরে যাক এটা নতুন মা'র ইচ্ছা নয়।

যা চেষ্টা করার, মোহনকে নিজেই করতে হবে।

খাওয়া হতে মোহন বাথরুমে ঢুকল। সঙ্গে নিল মাছের বেশ বড একটা কাঁটা আর কাগজের টুকরো। এই কাগজের টুকরোটা টুলের ওপর পেতে তার ওপর খাবারের পাত্র রাখা হতো।

বিকাল থেকে গানবাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির লোকেরা কোন কারণে হয়তো ফুর্তি করছে। সেই জন্য আজ খাবার-দাবারের এমন সুব্যবস্থা।

বাথরুমে ঢুকে মোহন মাছের কাঁটাটা নিজের বুড়ো আঙুলে ফুটিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

বাথরুমে রাখা দাঁতন সেই রক্তে মাখিয়ে মোহন সাবধানে কাগজের ওপর লিখল: বড় বিপদ। আমাকে বাঁচান—মোহন।

হাত ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, রোজকার মতন যামিনীর মা বসে বসে ঢুলছে। অবশ্য বাইরে দারোয়ান সজাগ। মোহনের পালাবার কোন সুযোগ নেই।

পা টিপে টিপে যামিনীর মা'র পিছনে গিয়ে মোহন কাগজটা কাঁটা দিয়ে তার থান কাপড়ে আটকে দিল, তার পর তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল।

যামিনীর মা উঠে বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যদি এই কাগজ এ বাড়ির কোন লোকের চোখে পড়ে, তাহলে মোহনের অদৃষ্টে দারুণ নির্যাতন আছে, কিন্তু মোহন মরীয়া। যা হবার হবে, এভাবে বন্দী থাকার চেয়ে মরণও ভাল।

যামিনীর মা এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটো গলি পার হয়ে আর এক বাড়ি কাজ করতে গেল। ভাগ্য ভাল মোহনের, এ বাড়ির কেউ টের পায়নি। সবাই গানবাজনায় মত্ত।

অন্য যে বাড়িতে যামিনীর মা কাজ করতে ঢুকল, সেখানে লোক মাত্র দু'জন। মা আর ছেলে। ছেলে কলেজে পড়ায়।

যামিনীর মা যখন বাসন মাজছে, তখন ছেলেটি কাগজের ওই টুকরোটি হঠাৎ দেখতে পেল। যামিনীর মা'র সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে কিছু শুনতেও পায় না। আস্তে আস্তে গিয়ে কাগজটা খুলে নিল।

কি ব্যাপার! কেউ যেন খুব বিপদে পড়েছে আর বাইরের লোকদের সেটা জানিয়ে দিতে চায়।

ছেলেটি আর অপেক্ষা করল না। কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

থানা কাছেই। দারোগা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। সামনে একজন পুলিশ। কাগজটা পেয়েই দারোগা সোজা হয়ে বসল। বলল, এটা পেলেন কোথায়?

কোথায় পেয়েছে ছেলেটি বলল।

রক্ত দিয়ে লেখা বলেই মনে হচ্ছে। তলায় নাম লেখা—মোহন।

মোহন নামটা পড়েই দারোগা ভ্রূ কোঁচকাল। আরে মশাই, পারিজাত বক্সি তো এই মোহন নামের একটি ছেলেকে খুঁজছিলেন। লালবাজার থেকে আমরা এই রকম নির্দেশ পেয়েছিলাম। দাঁড়ান, দাঁড়ান।

দারোগা ফোন তুলে কার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, পারিজাত বক্সি এখনই আসছেন।

পারিজাত বক্সি এলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। সাধারণ পোশাক। এসেই প্রথমে কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের এ ঝি কোথায় থাকে জানেন ?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ জানি। একটু দূরে একটা বস্তিতে থাকে। কাজে না এলে আমাকেই মাঝে-মধ্যে খোঁজ করতে যেতে হয়। ও বোবা, কানেও শোনে না, তবে কাজকর্ম ভাল করে।

চলুন, এখনই একবার তার বস্তিতে যাব। তাকে একবার আমার দেখা দরকার।

পারিজাত বক্সি আর ছেলেটি যখন বস্তিতে এসে পৌছল, তখন বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু তখনো লোকেরা জেগে। কেউ খাটিয়ার ওপর, কেউ দাওয়ায় বসে গল্প করছে।

যামিনীও বসেছিল। ছেলেটি তাকে ডাকল। তোমার মা কোথায় ?

শুয়ে পড়েছে।

একবার ডেকে দিতে পার ?

যামিনী মাকে ডেকে দিল। যামিনীর মা ঘুমোয়নি। ঘুমোবার আয়োজন করছিল।

ছেলেটি তখন যামিনীকে বলল, তোমার মাকে বলো, কাল ভোরবেলা যেন আগে আমাদের বাড়ি যায়। মা কালীঘাটে যাবে। আমাদের বাড়ির কাজ শেষ করে তবে অন্য জায়গায় যাবে।

যামিনী মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে, হাতের বিচিত্র ভঙ্গী

করে মাকে বুঝিয়ে দিল। যামিনীর মা ঘাড় নাড়ল, বুঝেছে।

পারিজাত বক্‌সি ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, এবার চলুন, আপনার বাসাটা একবার দেখে আসি।

ছেলেটি তাকে নিয়ে এসে তার বাসাটা দেখিয়ে দিল।

পারিজাত বলল, ঠিক আছে, কাল ভোরে আবার আমি আসব। আপনার আর বের হবার দরকার নেই। যা করার আমিই করব।

পরের দিন খুব ভোরে ছেলেটির বাড়ির সামনের ফুটপাথে আধময়লা গেঞ্জী আর হাঁটুর ওপর কাপড় পরা একটি লোককে দেখা গেল। চেহারা দেখে চাকর শ্রেণীর বলেই মনে হলো।

একটু পরে যামিনীর মা ঢুকল। লোকটি আড়চোখে লক্ষ্য করল।

প্রায় আধ ঘন্টা পর যামিনীর মা যখন বের হলো তখন বেশ একটু দূরে থেকে লোকটি তাকে অনুসরণ করল।

কাল ছেলেটির কাছে খবর সংগ্রহ করেছে যে, যামিনীর মা শুধু দু' জায়গায় কাজ করে। ছেলেটির বাড়ি আর সম্ভবত বদমাশদের আড্ডায়।

যামিনীর মা একটা পানের দোকানে থামল। পান আর দোক্তা কিনে মুখে দিল, তারপর আবার চলতে শুরু করল।

সরু গলি। কোন রকমে একটা মোটর যেতে পারে।

একটা বাড়িতে লোহার গেটে একটা গুর্খা দরোয়ান বসে। যামিনীর মা যেতেই সে গেট খুলে ভিতরে চলে গেল।

লোকটি বাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। কোন জানলা নেই। সারি সারি ঘুলঘুলি। হঠাৎ দেখলে গুদাম ঘর বলেই মনে হয়।

মিনিট দশেক। তারপরই বিরাট একটা কালো ভ্যান এসে দাঁড়াল। পুলিশ বোঝাই।

ভ্যানটা থামতেই পুলিশগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল। হাতে রাইফেল।

সঙ্গে একজন সহকারী কমিশনার। উদ্যত রিভলভার নিয়ে

লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এই বাড়িটাই তো ?

তাই তো মনে হচ্ছে।

সহকারী কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদের নির্দেশ দিল। পুলিশরা সারা বাড়ি ঘিরে ফেলল।

ব্যাপার দেখে পথচারীব দল ভীড় করে দাঁড়াল।

সহকারী কমিশনার, ছদ্মবেশে পারিজাত বক্সি আর কয়েকজন পুলিশ মিলে গেটের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

একতলায় কেউ নেই। আলকাতরার অনেকগুলো পুরানো ড্রাম পড়ে রয়েছে।

সকলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার সিঁড়ি। একজন পুলিশ টর্চ জ্বালল। সবাই ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলায় কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ নিজেদের অস্ত্র ঠিক করে ধরল।

সকলে ওপরে উঠে দেখল দোতলা ফাঁকা। শুধু যামিনীর মা দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ কোথাও নেই।

পারিজাত বক্সি অবাক হয়ে গেলেন। ছুটে এ-ঘর ও-ঘর দেখলেন, কেউ নেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে সব গেল কোথায় ?

সহকারী কমিশনার যামিনীর মাকে প্রশ্ন করল, এরা সব কোথায় পালাল ? তুই নিশ্চয় জানিস, বল ঠিক করে। না হলে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাব।

পারিজাত বক্সি ছুটে এলেন। বললেন, আরে ও বোবা, কালা। ওকে কিছু বলে লাভ নেই। চলুন, ছাদে উঠে দেখা যাক।

সকলে ছোট সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল।

ঘেঁষাঘেষি বাড়ি। দুটো বাড়ির মধ্যে কোন ফাঁক নেই। সহজেই এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে যাওয়া যায়। একটা ছোট ছেলেও পারে।

সহকারী কমিশনার বলল, আশপাশের দু'একটা বাড়ি দেখলে হয়।

পারিজাত বক্সি বললেন, দেখুন। তাঁর গলায় কোন জোর নেই। এভাবে পাখি উড়ে যাবে সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কি করে পুলিশ আসার খবর পেল, সেটাই আশ্চর্য।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর সহকারী কমিশনার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ফিরে এল।

আশপাশের সব বাড়িগুলো গুদাম ঘর। তুলো আছে, সর্ষে আছে, কয়লা আছে। সব আছে, কেবল বদমাশগুলোই নেই।

পারিজাত বক্সি চলে এলেন। তিনি রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এভাবে বদমাশের দল চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে, তার পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

দিন দুয়েক পরে হাওড়া পুলের পাশে যেখানে সার সার ভিখারি বসে থাকে—কানা, খোঁড়া, নুলো—সেখানে নতুন এক ভিখারির আমদানি হলো। অন্ধ ভিখারি, পাকা চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। পথচারীর দিকে হাত বাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে পয়সা চায়।

রাত হলে আর একটি লোক এসে অন্ধের পাশে দাঁড়ায়। তার কাঁধে ভর দিয়ে অন্ধ লোকটি বড়বাজারের দিকে চলে যায়।

অন্ধ লোকটির ঠিক পাশেই বসে একটি নুলো ছেলে। দুটো হাত কনুই থেকে কাটা। সারা দিন রাস্তায় মাথা ঠুকে ভিক্ষা চায়।

কয়েক দিন পর অন্ধ লোকটি নুলো ছেলেটিকে বলল, শুনছি, সরকার থেকে আমাদের জন্য একটা আশ্রম তৈরি করে দেবে। এভাবে রোদে পুড়ে জলে ভিজে আমাদের আর ভিক্ষা করতে হবে না। তাও যদি ভিক্ষার সব ক'টা টাকা নিজে পেতাম তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ টাকা তো অন্য লোকে ছিনিয়ে নেয়।

নুলো চুপচাপ বসে শুনল। কোন উত্তর দিল না।

অন্ধ লোকটা আবার বলল, তোমার সব টাকা তুমি পাও?

মুলো এবার উত্তর দিল, কেন পাব না? আমার ভিক্ষা করা টাকা আবার কে পাবে! এই পয়সায় আমাকে গোটা সংসার চালাতে হয়।

অন্ধ লোকটি আর কিছু বলল না।

পরের দিন থেকে তাকে আর সে জায়গায় দেখা গেল না।

যে লোকটি অন্ধকে সকালে বসিয়ে যায় আর বিকালে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তাকে অন্ধ লোকটি বলল, এখানে সুবিধা হবে না। অন্য কোথাও আমাকে বসিয়ে দেবে।

কোথায় বসবেন বলুন?

মেয়ো রোডের ওপর অন্য ভিখারিদের পাশে বসিয়ে দাও, বরাত ঠুকে দেখি একবার।

সঙ্গের লোকটি বলল, মোহনের বাবা ক'দিন দেখা করতে এসে ফিরে যাচ্ছেন।

বেচারা মোহনের বাবা! সত্যি তাঁর কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। সেদিন এভাবে বদমাশগুলো হাওয়া হয়ে যাবে, ভাবতেও পারিনি।

একটা কথা মনে হয় পারিজাতদা।

কি বলো?

ওই যে যামিনীর মা, ও কি সত্যি বোবা আর কালা? আমার তো সন্দেহ হয়। সম্ভবত সব খবর আগে থেকে ও-ই দিয়ে রেখেছিল। কেউ যে ওকে অনুসরণ করছে, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল।

পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই রকম একটা সন্দেহ আমারও হয়েছিল। বস্তিতে আমার একটা চর বসিয়ে রেখেছিলাম। সে রিপোর্ট দিল, যামিনীর মা সত্যিই বোবা এবং কালা। এ বস্তিতে যামিনীর মা বহু বছর আছে। সবাই একথা জানে।

তাহলে?

সেটাই বুঝতে পারছি না। এটুকু বুঝতে পারছি, ওদের দলের

কেউ নিশ্চয় আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। তুমি একটা কাজ করো।

কি বলুন ?

তুমি মোহনের বাবাকে দিন সাতেক পরে দেখা করতে বলো।

কিন্তু ভদ্রলোক যে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

খুবই স্বাভাবিক। উদ্বিগ্ন আমিও হয়ে উঠেছি। মোহনকে শেষ হয়তো করবে না, কিন্তু তাকে অন্ধ বা খোঁড়া করে দিয়ে অন্য প্রদেশে চালান দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আপনার কথামত পালা করে হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে আমি লোক বসিয়ে রেখেছি। সেরকম কিছু সন্দেহ হলেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

পারিজাত বক্সি ম্লান হাসলেন।

আরে, ওরা কি আর ছেলেটাকে ওভাবে নিয়ে যাবে। হয়তো বোরখা পরিয়ে মেয়েছেলে সাজিয়ে ট্রেনে তুলবে। তার চেয়ে একটা কাজ করো।

কি কাজ ?

যেখানে যেখানে ভিখারিদের ঘাঁটি আছে, কাল সকাল থেকে তুমি আর আমি সেখানে ঘুরে বেড়াব। এ বেশে নয়, মোটরে ঘুরব। তাহলে অল্প সময়ে অনেকটা ঘোরা হবে। মোহনের ফটো তো রয়েইছে আমার সঙ্গে। মিলিয়ে দেখব।

আপনার কি মনে হয়, এর ভেতর ওরা মোহনের সর্বনাশ করেছে ?

কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে দলটা বেশ পাকা। যা হোক মোহনের বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে একবার ভিখারিদের জগতটা দেখে নিতে চাই।

আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম।

কি ?

ধরুন যদি মোহনের বাবা টাকাটা নিয়ে হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে দাঁড়ান, তাহলে নিশ্চয় কেউ টাকাটা

নিতে এগিয়ে আসবে।

সম্ভবত।

তখন তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না?

তাতে লাভ? গ্রেপ্তার করা হলে দেখবে, সে হয়তো স্টেশনের কুলি কিংবা কোন ভিখারি। সে বলবে, এক বাবু তাকে প্যাকেটটা নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর সারা শহর খুঁজেও সে বাবুকে তুমি পাবে না।

দু'জনে আস্তে আস্তে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

সরু গলি। দু'পাশে উঁচু উঁচু বাড়ির সার। লোকজন বিশেষ নেই।

এক ধারে কালো রংয়ের ছোট্ট একটা মোটর। এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পারিজাত বক্‌সি মোটরের মধ্যে গিয়ে বসল। সঙ্গের লোকটি চালকের আসনে।

মোটরের দু' পাশের কাচে এমন রং করা যে, ভিতর থেকে দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে আরোহীদের লক্ষ্য করা যায় না। তা ছাড়া বন্দুকের গুলি এ কাচের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

মোহনের বাবাকে পারিজাত বক্‌সি দুপুর বেলা গঙ্গার ধারে দেখা করতে বলেছিলেন।

কথামতো একটা বট গাছের তলায় মোহনের বাবা দাঁড়িয়েছিল, পারিজাত বক্‌সির মোটর সেখানে এসে দাঁড়াল।

`শিগ্‌গীর উঠে আসুন।

মোহনের বাবা উঠে বসল।

গঙ্গার তার ধরে মোটর সোজা ছুটল। মেটিয়াবুরুজের কাছাকাছি এসে থামতে পারিজাত বক্‌সি বললেন, ইস্‌, আপনার চেহারা তো বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে।

সত্যিই মোহনের বাবার দেহ আধখানা হয়ে গিয়েছিল। কোটরাগত চোখ, গালের চোয়াল ঠেলে উঠেছে। মনে হলো, রাতে বোধহয় একতিল ঘুমও হয় না।

মোহনের বাবা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, আপনার কথা শুনে আমি

খুব ভুল করেছি। আমার উচিত ছিল, চিঠিটা পেয়েই পাঁচ হাজার টাকা লোকটাকে দিয়ে দেওয়া। তাহলে আমার ছেলেটাকে ফিরে পেতাম।

তখনই পারিজাত বক্‌সি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। একটু ইতস্তত করে বললেন, আমি আপনার কাছে খুবই লজ্জিত। এতদিন কেটে গেল, আপনার ছেলের ব্যাপারে কোন সুরাহা করতে পারছি না। বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না। আমি গত তিন দিন ধরে এ শহরে যেখানে যেখানে ভিখারি বসে, সেখানে ঘুরেছি কিন্তু আপনার ছেলেব হদিশ পাইনি। আমার খুবই বিশ্বাস যে, বদমাশগুলো আপনার ছেলের চরম সর্বনাশ এখনো করেনি।

সে আমিও জানি।

পারিজাত বক্‌সি বিস্মিত হলেন। আপনিও জানেন? মানে?

মোহনের বাবা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। বলল, এই দেখুন, কাল আমি আর একটা চিঠি পেয়েছি।

কাগজটা হাতে নিয়ে পারিজাত বক্‌সি জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিটা কিভাবে পেলেন?

সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দরজার ওপর এটা আটকানো রয়েছে।

পারিজাত বক্‌সি চিঠিটা পড়তে লাগলেন—এই শেষবার আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। টিকটিকির সাহায্য নিয়ে কোন ফল হবে না। দরকার হলে তাকেও আমরা খতম করব। আজ থেকে পনরো দিন পর শনিবার কালীঘাট মন্দিরের দরজায় সন্ধ্যাবেলা নগদ টাকা পৌঁছে দিতে হবে। তবে এবার আর পাঁচ হাজার টাকায় হবে না। সাত হাজার টাকা চাই।

টাকা পেলে আপনার ছেলে পরের দিনই দেবীগড় রওনা হবে, কিন্তু যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলেও আপনার ছেলে দেবীগড় রওনা হবে, তবে সম্পূর্ণ দেহে নয়, শুধু তার মুণ্ডুটি। এই শেষ চিঠি।

আগাগোড়া চিঠিটা লাল কালিতে লেখা। পারিজাত বক্‌সি চিঠিটা কোলের ওপর রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

অল্প দিনেই এ লাইনে বেশ নাম করেছেন তিনি। অনেক জটিল কেসের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। পুলিশ মহলের ওপরতলায় তাঁর দারুণ প্রতিপত্তি। কিন্তু সামান্য একটা ছেলে চুরির ব্যাপারে এমন অবস্থা হবে, তা তিনি ভাবতেই পারেননি। তাঁর মনে হলো, হঠাৎ হয়তো মোহনের কিছু বিপদ হবে না। বদমাশের দল খোঁজ নিয়েছে মোহনের বাবা দোকানের মালিক, কাজেই বেশ কিছু পয়সার অধিকারী। তারা এটুকুও বুঝতে পেরেছে যে, পারিজাত বক্‌সির চোখে ধুলো দিতে পারলে, মোহনের বাবা শীঘ্রই তার ওপর আস্থা হারাবে। বুঝতে পারবে, তার দ্বারা মোহনের উদ্ধার সম্ভব নয়, তখন হতাশ হয়ে ছেলে ফিরে পাবার আশায় টাকাটা দিয়ে দেবে।

পারিজাত বক্‌সি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি পনরো দিন পর টাকাটা ওদের দিয়ে দিতে চান ?

হ্যাঁ, সেই ইচ্ছাই আছে। পাঁচ হাজার টাকা আমি যোগাড় করেছি। বাকি দু' হাজার টাকা আমি জমি বিক্রি করে সংগ্রহ করব। এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

ঠিক আছে, আমাদের হাতে পনরো দিন সময় আছে। দেখি এর মধ্যে কি করতে পারি।

মোহনের বাবার মুখ দেখে মনে হলো, পারিজাত বক্‌সির কথায় সে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

মোহনের বাবাকে হাওড়া স্টেশনের একটু দূরে নামিয়ে দিয়ে পারিজাত বক্‌সি লালবাজারে গিয়ে হাজির হলেন।

একেবারে কমিশনার সাহেবের কামরায়।

কমিশনার চুরুট মুখে দিয়ে কতকগুলো ফটো দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আরে কি খবর বক্‌সি, অনেক দিন তোমার খবর পাইনি।

পারিজাত বক্‌সি চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আর খবর ! একটা

ব্যাপার নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কমিশনার হাসলেন, আরে, তোমরা তো ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকতেই ভালবাস। আমাদের চাকরিটাই ঝঞ্ঝাটের আর তোমরা শখ করে ঝামেলা মাথায় নাও। দাঁড়াও, এক কাপ কফি আনতে বলি।

কমিশনার কফির অর্ডার দিলেন।

পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এখন এ শহরে নামকরা ছেলেধরার দল ক'টা আছে?

কমিশনার হাসলেন, সব মহাপুরুষের নাম কি আর জানা যায়! তবে বড় দল ছিল গোটা চারেক। একটা দল অবশ্য পাঞ্জাবে চলে গেছে।

আস্তানার খোঁজ রাখেন?

এদের কি আর স্থায়ী আস্তানা থাকে। তোমার-আমার জ্বালায় অনবরত আস্তানা বদল করতে হয় ওদের। কেন হে, ছেলেধরার খোঁজ কেন?

পারিজাত বক্সি মোহনের কাহিনী সব বললেন।

কমিশনার খুব মন দিয়ে শুনে বললেন, ছেলেটাকে ইতিমধ্যে অন্ধ কিংবা খোঁড়া করে দেয়নি তো?

তা যদি করত তাহলে কি তার বাপের কাছে ওরকম চিঠি লিখত—টাকা দিলে ছেলে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে!

কিছু বলা যায় না। এরা সব পারে। টাকাটা পেলেই যে ছেলেটাকে বাপের কাছে ফেরত দেবে, তার কি গ্যারান্টি আছে?

পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলেন।

অসং লোকের অসাধ্য কোন কাজ নেই। মোহনকে হয়তো বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি বাড়তি টাকা হাতে আসে, মন্দ কি!

আচ্ছা, এ-দলের কোন লোকের ফটো আপনাদের কাছে আছে?

কয়েকজন বছর তিনেক আগে ধরা পড়েছিল, তাদের ফটো থাকা সম্ভব। তুমি বসো, আমি দেখছি।

কমিশনার বোতাম টিপলেন। একজন কনেস্টবল এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন—চৌধুরী সাব্।

পুলিশ বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একজন ছোকরা পুলিশ অফিসার এসে ঢুকল। বলল, ডেকেছেন স্যার?

এঁকে চেন তো?

হ্যাঁ, চিনি বই কি। বিখ্যাত লোক। অনেক গোলমেলে কেসের সমাধান করে দিয়েছেন।

আচ্ছা, ছেলেধরাদের যে অ্যালবামটা আছে, এঁকে দেখতে দাও।

মিনিট পনেরোর মধ্যে একটা অ্যালবাম এনে পারিজাত বক্সির হাতে দিল অফিসারটি।

পারিজাত বক্সি পাতা উল্টে ফটোগুলো দেখতে লাগলেন। প্রায় আটজন লোকের বিভিন্ন দিক থেকে তোলা অনেকগুলো ফটো।

পারিজাত বক্সি লক্ষ্য করেছেন, একটু রাত হলে অন্ধ খোঁড়া ভিখারিদের নিয়ে যাবার জন্য লোক এসে দাঁড়ায়। কাউকে চলতে সাহায্য করে, আবার কারও জন্য কাঠের গাড়ি আসে, তাতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য তারা দলের কেউ নয়। চাঁইদের নির্দেশে কাজ করে। বলতে গেলে মাইনে-করা চাকর। তাদের ফটো এ অ্যালবামে থাকা সম্ভব নয়।

তবু পারিজাত বক্সি মন দিয়ে ফটোগুলো দেখলেন, তারপর অ্যালবামটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

কমিশনার বললেন, যাচ্ছ! যদি পুলিশের কোন সাহায্যের দরকার হয় তো জানাবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় জানাব।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে পারিজাত বক্সি ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক দেখলেন। তাঁর ওপর কারও নজর রাখা কিছু বিচিত্র নয়। সাবধানে তিনি নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

॥ পাঁচ ॥

অন্ধকার ঘর। আশেপাশে অনেকগুলো তেলের খালি পিপে। তার মধ্যে মোহন বসে আছে। দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। দুটো পায়ে শিকল। সামনে একটা টুলের ওপর সেই বেঁটে লোকটা।

আমাদের আর দোষ নেই। তোর বাবাকে টাকাটা দিয়ে দেবার অনেক সুযোগ দিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেবার নাম নেই। এক টিকটিকির পাল্লায় পড়েছে বুঝতে পারছি। সে-ই মতলব দিচ্ছে।

মোহন কোন উত্তর দিল না। দেবার মতন উত্তরও তার কিছু নেই। সে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। আর তার বাবা সাহায্যের জন্য আসবে না, সেটুকু বুঝতে পেরেছে। অভিমানে তার বুক ভরে গেল। ধারণা ছিল, নতুন মা যেমন তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তেমনই বাবা কিন্তু খুব ভালবাসে। কিন্তু কই, টাকা নিয়ে তো বাবা এগিয়ে আসছে না। এদিকে দিন দিন এরা নানারকম নির্যাতন শুরু করেছে। প্রায়ই খাওয়া বন্ধ করে দেয়। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে।

যাক, তোর বাপকে শেষ চিঠি দিয়েছি। আর কিছুদিন দেখব, তারপর আমাদের মনে যা আছে তাই করব। গালাগাল দিতে দিতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানোর শব্দ এল।

আগের বাড়িটা তবু ভাল ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক সকালে দুটো লোক মোহনের চোখমুখ বেঁধে একটা থলির মধ্যে পুরে কাঁধে তুলে নিল। তারপর এইখানে এনে ফেলল।

তেলের একটা বিশ্রী গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে। দিনের বেলাও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বোঝাই যখন যাচ্ছে, বাবা টাকা দিয়ে উদ্ধার করতে আসবে না, তখন নিজের উপায় নিজেকেই করতে হবে। যেমন করে হোক পালাতে হবে এখান থেকে। তা না হলে, কিছুই বলা যায় না, এরা হয়তো জোর করে অন্ধ কিংবা খোঁড়া করে দেবে। আজীবনের মতন পঙ্গু।

পায়ে শিকল বাঁধা থাকলেও বসে বসে চলতে মোহনের কোন অসুবিধা হলো না। একেবারে কোণের দিকে খালি ড্রামের পিছন থেকে মোহন একটা ভাঙা পাইপের টুকরো কুড়িয়ে পেল। দেড় ফুট লম্বা, বেশ ভারি। অস্ত্র হিসাবে চমৎকার।

মোহন সেটাকে বেশ সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখল। যা হবার হোক, মোহন একেবারে মরীয়া।

পরের দিন ভোরবেলা দারোয়ান রোজকার মতন দরজা খুলল। ভিতরে ঢুকে মোহনের হাত-পায়ের বাঁধনও খুলে দিল। এ সময় মোহনের কলঘরে যাবার কথা, তাই এ ব্যবস্থা।

মোহন কলঘরে গিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করল বটে, কিন্তু কলঘরের ভিতরে গেল না।

ড্রামের মধ্যে থেকে ভাঙা পাইপটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

দারোয়ান চৌকির ওপর বসে সুর করে দুলে দুলে কি গাইছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে। মোহন ভাঙা পাইপ তুলে প্রাণপণ শক্তিতে দারোয়ানের মাথায় আঘাত হানল। অস্ফুট আর্তনাদ করেই দারোয়ান লুটিয়ে পড়ল।

মোহন আর তিলমাত্র দেরি করল না। পাইপের টুকরোটা ফেলে দিয়ে তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করল।

কিছুটা এগিয়েই নীচে নামার সিঁড়ি। মোহন বুঝতে পারল, সিঁড়ি দিয়ে নামা উচিত হবে না। দলের লোকেরা নিশ্চয় নীচে আছে। সে উল্টোদিকে ছুটল।

বারান্দার কোণে ছোট একটা জানলা। তার ফাঁক দিয়ে একটা অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল।

বহু কষ্টে মোহন নিজের শরীরটা সেই ছোট জানলার মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল।

এদিকে ওদিকে ভোরের ঝাপসা কুয়াশা। একটু দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। জানলা থেকে লাফ দিয়ে মোহন গাছের একটা ডাল ধরল। পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গাছে চড়া খুব অভ্যাস আছে। তরতর করে ডাল বেয়ে নীচে নেমে এল সে।

ছোট ছোট আগাছার ঝোপ। ঝোপের আড়ালে বসে একবার বাড়িটার দিকে দেখল। না, কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। মনে হয় কেউ এখনো জাগেনি। মোহনের পালিয়ে যাবার কথা কেউ জানতে পারেনি।

গুড়ি দিয়ে মোহন এগিয়ে গেল। সামনের ইঁটের স্তূপ দেখে মনে হলো, এখানে এক সময় বাড়ির ভিটে ছিল। বাড়িও থাকতে পারে। হয়তো পুরানো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেছে, কিংবা আদৌ বাড়ি তৈরিই হয়নি। ভিত পর্যন্ত গাঁথা হয়েছিল।

মোহনের ভয় হলো, দিনের আলোয় চলাফেরা করলে কারো চোখে পড়ে যাবে। বদমাশদের দল খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চয় এদিকে আসবে। তার চেয়ে ঝোপের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে মোহন ঢুকে পড়ল।

ঘাস খুব নরম। যেন বিছানা।

দুপুর কাটিয়ে বিকাল হলেই মোহন উঠে পড়বে। শীতকালে তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার খুব সুবিধা। একবার রাস্তায় পৌঁছতে পারলে, লোককে জিজ্ঞাসা করে করে ঠিক হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবে। তারপর টিকেট চেকারবাবুদের হাতে-পায়ে ধরে দেবীগড় যেতে খুব অসুবিধা হবে না।

তীক্ষ্ণ একটা হাসির শব্দে মোহনের ঘুম ভেঙে গেল। সব ব্যাপারটা বুঝতে তার বেশ একটু সময় নিল। চোখ খুলে দেখল, সামনে ঘাসের ওপর বেঁটে মোটা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

একে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না মোহন। লাল চোখ, নাক প্রায় নেই বললেই হয়, সারা মুখে বসন্তের দাগ, হলদে ছোপ লাগা দাঁত। লোকটা বলল, কি রে, খুব চালাক হয়েছিস? এবার তো ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে।

মোহনের গলা থেকে স্বর বের হলো না। আস্তে আস্তে বলল, ফাঁসি কাঠে?

আলবত। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দারোয়ানকে খতম করে পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস? ওঠ, পুলিশ তোকে খুঁজছে।

ঠিক বেড়াল যেমন ইঁদুরকে মুখে ঝুলিয়ে নেয়, ঠিক তেমনই লোকটা মোহনের শার্টের কলার ধরে তুলে নিল।

কথা বলা দূরে থাক, মোহনের কিছু চিন্তা করারও শক্তি নেই। সর্বনাশ, মানুষ মারার জন্য শেষকালে তার ফাঁসি হবে। কিন্তু এই লোকগুলো যে তাকে বন্দী করে রেখে নির্মম অত্যাচার করছিল, শুধু এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই যে সে দারোয়ানকে মারতে বাধ্য হয়েছে, একথা পুলিশ শুনবে না?

লোকটা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

গাছ থেকে নামবার সময় দু'এক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল, এবারের টানা-হেঁচড়ানিতে অনেক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

দোতলায় নিয়ে গিয়ে মোহনকে আছড়ে ফেলল লোকটা।

মোহন উঠে বসেই অবাক। দারোয়ানের শুধু মাথায় ব্যাণ্ডেজ। সে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছে। সামনে কোমরে হাত দিয়ে বদমাশের দলের সর্দার দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা চাবুক। সে বলল, উঠে দাঁড়া। তোকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।

কাঁপতে কাঁপতে মোহন উঠে দাঁড়াল।

সর্দার চাবুকটা উঁচুতে তুলে নামিয়ে আনার মুহূর্তেই থেমে গেল। একটা লোক ছুটতে ছুটতে আসছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কোমরে লাল গামছা বাঁধা। জোয়ান চেহারা। কাছে এসে সে ইশারায় সর্দারকে ডাকল।

চাবুক গুটিয়ে সর্দার তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দু'জনে ফিসফিস করে কি কথা হলো। মনে হলো, সর্দারের চোখমুখে যেন চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। লোকটা আবার দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল।

সর্দার মোহনের কাছে এসে তাকে একটা লাথি মারল। মোহন ছিটকে গিয়ে কামরার মধ্যে পড়ল। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মোহনের মনে হলো, তার কোমরটা বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। সে বুঝি আর উঠে দাঁড়াতেই পারবে না।

এক সময় আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে মোহন উঠে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করল।

নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে লোকটার কথায় সদার অত চিন্তিত হয়ে উঠল কেন? তাহলে কি পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে? মোহন এগিয়ে এসে দরজায় কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই। সব চুপচাপ।

মোহন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মেঝের ওপর বসে পড়ল। বসে বসে ভাবতে লাগল, সে ভুল করেছে। ওভাবে ঘাস-বনের মধ্যে বসে না থেকে আরও দূরে চলে যেতে পারত। এদের নাগালের বাইরে।

সন্ধ্যার পর দরজা খুলে গেল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। পরিশ্রান্ত দেহ।

মোহন ভাবল, কেউ নিশ্চয় খাবার নিয়ে এসেছে। কিন্তু না। যে লোকটা মোহনকে ধরে নিয়ে এসেছিল, সে এসে ঢুকল। তার হাতে কালো কাপড়ের একটা বাণ্ডিল। সে বলল, নে, এটা পরে নে। লোকটা কাপড়ের বাণ্ডিলটা মোহনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

মোহন জানে, এদের কথা অমান্য করলে আবার শাস্তি পেতে হবে। কাপড়টা তুলে দেখল, একটা বোরখা। বলল, এটা পরব? এটা তো মেয়েদের।

লোকটা খিঁচিয়ে উঠল। বেশী কথা বলিসনি। যা বলছি, তাই কর।

মোহন বোরখাটা পরে নিল। চোখের সামনে জাল দেওয়া। সামনের পথ দেখবার জন্য।

দেখি, তোর হাত দুটো।

মোহন দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

লোকটা মোহনের হাতের চেটোয় কি মাখিয়ে দিল।

মোহন নিজের দুটো হাত চোখের সামনে এনে দেখল। মেহেদি বাটা। চেটো দুটো হলদে হয়ে গিয়েছে।

নে চল। রাস্তায় যদি একটা কথা বলবি তো গর্দান থেকে ধড় আলাদা করে দেবো।

এভাবে চলা মুশকিল। ঠোক্কর খেতে খেতে মোহন এগিয়ে চলল। বুঝতে পারল, লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে।

বেশী দূর নয়। কিছুটা গিয়েই মোহনকে থামতে হলো।

সঙ্গের লোকটা কর্কশ কণ্ঠে বলল, দাঁড়া এইখানে।

মোহন দাঁড়াল।

একটা মোটরের শব্দ। মনে হলো, মোটরটা সামনে এসে থামল।

লোকটা মোহনের হাত ধরে মোটরে উঠল।

মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটে চলল।

জালি-কাটা নক্সা দিয়ে মোহন দেখল, মোটর সরু গলি ছাড়িয়ে চৌরাস্তায় এসে পৌঁছল। চারদিকে ট্রাম-বাস, অগণিত লোকজন।

এত ভীড়ের মধ্যেও মোহন কত অসহায়। চীৎকার করে উঠতে সাহস হলো না। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই সঙ্গের লোকটা হয়তো গলা টিপে তাকে শেষ করে দেবে। এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

অনেকটা চলার পর মোহনের মনে হলো, মোটরটা যেন এবার থামল। মনে হলো, একটা রেল স্টেশন।

মোটর থামতেই আর একটা লোক এসে চাপা গলায় বলল,

সব ঠিক আছে।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে সঙ্গের লোকটা বলল, কত দেরি ?

মিনিট দশেক।

মোহনকে ধরে রাস্তায় নামিয়ে লোকটা আবার সাবধান করে দিল, একটি কথা যেন মুখ থেকে না বের হয়।

তিনজনে স্টেশনে এসে ঢুকল। একটু পরেই ইঞ্জিনের গর্জন। ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

যাত্রীদের হৈ-চৈ। ফেরিওয়ালাদের সোরগোল। তারই মধ্যে দু'জন দু'ধার থেকে মোহনের হাত ধরে ট্রেনে তুলল। একেবারে কোণের বেঞ্চে—মাঝখানে মোহন, দু'পাশে দু'জন তার দেহের সঙ্গে চেপে বসল।

এক সময় ট্রেন ছাড়ল।

মোহনের মনে হলো, তাহলে কি এরা তাকে নিজের গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ? দেবীগড়ে ?

হয়তো বাবার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে। যে টাকা এরা চেয়েছিল সেটা পেয়ে গেছে। মনে খুবই আনন্দ হলো মোহনের। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

ট্রেনের কামরায় অন্য যাত্রীও রয়েছে। তাদের মুখগুলো মোহন অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল।

একটু পরেই মোহনের চাপা আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো।

সামনের বেঞ্চে বসা একটি লোক প্রশ্ন করল, মিঞাসায়েব কতদূর যাবেন ?

মোহনের ডানপাশের লোকটি বলল, আর বলেন কেন ভাই। বোনের এই মেয়েটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেলাম। ডাক্তার, বদ্যি, হেকিম কিছু করতে পারল না। এখন দৈব ভরসা।

অসুখটা কি ?

মাথার রোগ। এলোমেলো বকে। তাই পাণ্ডুয়ায় পীর-

সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। শুনেছি, তাঁর ফুল পড়ায় খুব কাজ হয়।

মোহন কথা বলতে গিয়েই সহসা উঃ করে থেমে গেল। পাশের লোকটা সজোরে চিমটি কেটেছে পাঁজরার নীচে। বোধহয় সে আন্দাজ করেছিল যে, মোহন প্রতিবাদ করে উঠবে।

অন্য লোকটি ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি হলো মরিয়ম, আবার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

একরকম জোর করেই তারা মোহনকে শুইয়ে দিল।

মোহনের চিন্তার শেষ নেই। তাকে এরা কোথায় নিয়ে চলেছে? তাহলে সম্ভবত তার বাবা এদের টাকা দেয়নি। সেই জন্য এরা মোহনকে মেরে ফেলবে। মরার পরে মোহনের দেহ নিয়ে এরা যা ইচ্ছা করুক, তাতে মোহনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এক কামরা লোক সঙ্গে চলেছে। এরা কি কেউ মোহনকে একটু সাহায্য করতে পারে না? মোহন যদি চীৎকার করে ওঠে! বোরখা খুলে ফেলে বলে, আমি মরিয়ম নয়, মোহন। তোমরা আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে মেরে ফেলতে নিয়ে চলেছে। তাহলে কি কেউ সাহায্য করবে না? এমন সুযোগ হয়তো জীবনে আর আসবে না।

কিন্তু একটা লোক তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার আসল উদ্দেশ্য অন্য। যদি মোহন কোন রকম বেয়াদবি করে কিংবা চেঁচামেচি করার চেষ্টা করে, তাহলে তার মুখ চেপে ধরবে। গলা টিপে ধরাও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। যা হবার তাই হবে।

মোহন জানে, বাবার জমিজমা আছে। অত বড় কাপড়ের দোকানের মালিক। আসল কথা, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মন বাবার নেই। থাকলে বাবা টাকাটা নিশ্চয় দিয়ে দিত। মোহন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, একটা হাত তার গলার ওপর চেপে বসল।

ট্রেন থামতে মোহনকে নিয়ে দু'জনে উঠে পড়ল। অন্ধকার

স্টেশন। টিম টিম করছে আলো। জালি-কাটা নক্সার ফাঁক দিয়ে মোহন চেয়ে চেয়ে দেখল।

স্টেশনের এলাকা পার হয়ে সবাই রাস্তায় নামল। তারপর হাঁটা। বেশ অনেকটা পথ।

এক জায়গায় এসে সঙ্গের একজন বলল, দাঁড়া।

মোহন দাঁড়াল। ওর বোরখাটা টেনে খুলে দিল সে লোকটা।

মোহন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

চারদিকে জঙ্গল। দূরে দূরে আলোর আভাস। অজ পাড়াগাঁ বলেই মনে হচ্ছে। মোহনের ভয় হলো। নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এরা বোধহয় মোহনকে শেষ করে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না।

চলতে চলতে মোহন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

কোন উত্তর নেই। আবার সাহস করে মোহন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?

এবার সঙ্গের একজন কর্কশ কণ্ঠে বলল, ফেলব বই কি। আবার পালাবার চেষ্টা করলে একদম খতম। তোর জন্যে আমাদের কম হয়রানি কি! বিচ্ছু কোথাকার।

সামনে ভাঙা একটা মন্দির। অনেক পুরানো। এত পুরানো যে, ফাটলে ফাটলে বুনো গাছ গজিয়েছে। তার পাশে একতলা একটা বাড়ি। তারও জরাজীর্ণ অবস্থা।

এখন অন্ধকার অনেকটা কম। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ম্লান আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মোহনকে দাঁড় করিয়ে একজন মেঠো রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। বাড়িটার সামনে গিয়ে চেঁচাল—মেঘা, মেঘা!

বারকয়েক ডাকবার পর যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মোহন আঁতকে উঠল। কালো কুচকুচে রং। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। জবাফুলের মতন টকটকে রাঙা চোখ। খালি গা। বাঁ হাতে তাবিজ বাঁধা।

মেঘা, এই ছেলেটাকে তোর কাছে রাখতে হবে। এক নম্বরের শয়তান। একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। খুব চোখে চোখে রাখবি।

মেঘার দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। হা হা করে এমনভাবে সে হেসে উঠল যে, কাছে গাছের ডালে বসে থাকা গোটা কয়েক পাখি ঝটপট করে উড়ে গেল। হাসতে হাসতেই সে বলল, পালাবে আমার কাছ থেকে! একেবারে চণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবো না! হুঁ।

মেরে ফেলার ভয় মোহনকে বদমাশ দলের অনেকেই দেখিয়েছে, কিন্তু এই লোকটার কথা শুনে মোহনের বুকটা গুরগুর করে উঠল। মনে হলো, কিছুই যেন এর অসাধ্য নয়।

বইতে আগের যুগের যে সব ডাকাতের কাহিনী মোহন পড়েছিল—বিশে ডাকাত, নিধিরাম সর্দার—তাদের সঙ্গে লোকটার মিল আছে। কে জানে, লোকটা হয়তো ডাকাতও হতে পারে।

নে আয়। মেঘা বজ্রমুষ্টিতে মোহনের হাত ধরে টানল।

আর একটু হলে মোহন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত মাটির ওপর।

তাহলে আমরা চলি মেঘা। সর্দারকে গিয়ে বলব, ছোকরাকে তোর জিম্মায় দিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন চিন্তা নেই। আমি ঠিক শায়েস্তা করে রাখব।

ছোট একটা ঘর। দেয়ালগুলো ফেটে গেছে। মেঝেও চৌ-চির। সেখানে নিয়ে গিয়ে মেঘা একটা চাটাই নিয়ে ছুড়ে দিয়ে বলল, নে তোর বিছানা। জিরিয়ে নে।

মোহনকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মেঘা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল।

বাড়িটা জরাজীর্ণ কিন্তু মজবুত শাল কাঠের দরজা। বড় বড় লোহার হুড়কো।

রাতের ফিকে আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। পরিশ্রান্ত মোহন কোন রকমে টলতে টলতে চাটাইয়ের ওপর গিয়ে শুয়ে

পড়ল। সকাল থেকে পেটে একবিন্দু খাবার পড়েনি। তেষ্টায় বুকটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

আসতে আসতে পথে একটা ডোবা দেখেছিল। একবার যদি কিছুক্ষণের জন্যও ছাড়া পেত, তাহলে মোহন ছুটে গিয়ে আঁজল ভরে সেই ডোবার জল খেয়ে আসত।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেছে মোহনের খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতেই সে চমকে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার, চাঁদ সরে গেছে। কে যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে।

দরজা খুলে যেতে ঘরের মধ্যে আলোর রেখা এসে পড়ল। কেরোসিনের কুপি হাতে নিয়ে কে একজন ঢুকল। কাছে আসতে মোহন ভাল করে দেখতে পেল। কালো কুৎসিত চেহারা। শনের নুড়ির মতন চুল। সামনের গোটা তিনেক দাঁত বীভৎস ভাবে বেরিয়ে আছে। এক হাতে তেলের কুপি, অন্য হাতে একটা মাটির সরা। সরাটা মোহনের সামনে নামিয়ে রেখে বুড়ী খনখনে গলায় বলল, নে গিলে নে। আমি সরাটা নিয়ে যাব।

মোহন সোৎসাহে এগিয়ে এসেই হতাশ হলো। পান্তা ভাত। বিশ্রী একটা গন্ধ বের হচ্ছে। পাশে শাকের তরকারি।

কিন্তু তার পেটে তখন আগুন জ্বলছে। খাবারের বাছবিচার করার সময় তার নেই। সে কোন রকমে পান্তা ভাত শেষ করে ফেলে বলল, একটু জল।

বুড়ী খিঁচিয়ে উঠল। নবাবপুত্তুরের কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। বেরিয়ে গিয়ে মাটির গেলাসে জল এনে রাখল। তারপর মোহনের খাওয়া শেষ হলে সরা গেলাস তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তেলের কুপিটা জ্বলছে। কতটুকুই বা আলো। মোহনের দীর্ঘ ছায়া দেয়ালের ওপর কাঁপছে। একটু পরে মোহন চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল।

রাত কত হলো খেয়াল নেই, হঠাৎ হাতের ওপর ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে মোহন চীৎকার করে জেগে উঠল। বিশ্রী একটা

স্বপ্ন দেখছিল মোহন। কতকগুলো ষণ্ডামার্কা লোক তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। সামনে চণ্ডেশ্বরীর মূর্তি। কালীমূর্তিরই মতন। লাল টকটকে জিভ। হু'চোখে যেন আগুন ছুটছে। তার সামনে হাঁড়িকাঠ। মূর্তির সামনে এক পুরোহিত বসে পূজা করছে। তার চেহারাও ভয়াবহ।

সবাই মিলে মোহনকে ধরে হাঁড়িকাঠে ফেলল। গলাটা আটকে দিল। সেই মুহূর্তে মোহনের চোখের সামনে বাবার চেহারা ভেসে উঠল। বিড়বিড় করে মোহন বলল, তুমি আমার জন্য কিছু করলে না বাবা। দেখ, এরা আমায় শেষ করে দিচ্ছে। আর জীবনে কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

তারপর একটা লোক বিরাট একটা খাঁড়া নিয়ে মোহনের ঘাড়ে স্পর্শ করাল। কনকনে ঠাণ্ডা স্পর্শ। মোহন জেগে উঠল।

তেলের কুপির আলোটা কমে এসেছে। সেই আবছা আলোয় মোহন সভয়ে দেখল, বিরাট কালো রংয়ের একটা সাপ মোহনের হাতের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সাপের মাথায় খড়মের মতো চিহ্ন আঁকা।

মোহন গাঁয়ের ছেলে। অনেক রকম সাপ দেখেছে। সাপও চেনে। এটা গোখরো সাপ। দারুণ বিষধর। এক ছোবলেই শেষ।

কেউটের মতন এরা সহজে তেড়ে আসে না। কিন্তু মোহন এর আস্তানায় হানা দিয়েছে, কাজেই রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি তেড়ে আসে, তাহলে মোহনের পালাবার কোন পথ নেই। জানলা নেই। ঘুলঘুলি। তাও অনেক ওপরে।

তাহলে এদের উদ্দেশ্য বোধহয় মোহনকে এইভাবে মেরে ফেলা। নিজের হাতে কিছু করবে না। তাতে অনেক হাঙ্গামা। সাপের কামড়ে মারা গেলে বলবার কিছু নেই।

সাপটা আস্তে আস্তে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেল।

সারাটা রাত মোহন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুতে আর

সাহস হলো না। কি জানি, সাপটা যদি আবার বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া চারদিকে অজস্র ফাটল। সাপের থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। আরও কত সাপ আছে বলা যায়!

সকালে যখন দরজা খুলল, তখন মোহন ঘুমিয়ে পড়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে কখন মোহন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। তারপর এক সময়ে চাটাইয়ের ওপর ঢলে পড়েছে।

আরে এই, ওঠ ওঠ।—বাজখাঁই গলার আওয়াজে মোহনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ মুছে দেখল, সামনে মেঘা দাঁড়িয়ে।

মেঘা বলল, নে বাইরে চল।

মোহন উঠে দাঁড়াল। তাহলে কি তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে? মেঘার পিছন পিছন মোহন বেরিয়ে এল।

বিরাট মাঠ। মাঝে মাঝে আকন্দ বনতুলসী আর কেয়াগাছের ঝোপ। পাশে একটা ডোবা। শ্যাওলায় জল সবুজ হয়ে আছে।

নে, মুখহাত ধুয়ে নে।

মোহন ডোবার জলে মুখ ধুতে লাগল।

বিশ্রী পাঁকের গন্ধ জলে। মুখে দিলেই বমি হয়ে যাবে যেন। কিন্তু উপায় নেই।

মুখ ধুয়ে মোহন আবার ঘরে ফিরে এল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, এবার আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হলো না। দরজা খোলাই রইল।

কি ব্যাপার? মোহন একটু পরেই তা বুঝতে পারল।

খোলা দরজা দিয়ে বুড়ী ঢুকল। হাতে মাটির সরা। সরাতে দু'খানা আধপোড়া রুটি আর একটু গুড়। সরাটা নামিয়ে বুড়ী যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন সাহস করে মোহন ডাকল, দিদিমা।

বুড়ী ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়াল।

দিদিমা! এ আবার কি ডাক? কে তুই সাতপুরুষের কুটুম? আমার কেউ কোথাও নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

একটা কথা দিদিমা! মোহন কাতর কণ্ঠে বলল।

কি বলবি বল। তখন থেকে দিদিমা দিদিমা করছিস।

এ ঘরে থাকতে বড় ভয় করছে।

ভয়? কিসের ভয়?

সাপের। কাল রাত্তিরে আমার হাতের ওপর দিয়ে একটা সাপ গিয়েছে।

বুড়ী কথাটা শুনে হাসতে শুরু করল। হাসির চোটে চোখ দুটো বুজে গেল। সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।—অ-মা, ও সাপে ভয় কি? ওরা তো বাস্তু সাপ। ওরা কিচ্ছু করে না। এখানে একজোড়া আছে। প্রতি মঙ্গলবার আমি ওদের দুধ-কলা খাওয়াই।

একটা নয়, এক জোড়া? সর্বনাশ! মোহন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

এই ঘরে জোড়া সাপের সঙ্গে থাকতে হবে! ঘুমিয়ে থাকার সময় কখন তাদের গায়ে হাত-পা গিয়ে পড়বে। ব্যস, অমনি ছোবল। অবশ্য বাঁচবার মোহনের আর ইচ্ছা নেই। বাবাই যখন আর তাকে চায় না তখন তার কি হবে বেঁচে!

দেবীগড়ে গিয়েই বা কি হবে। কিন্তু এভাবে সাপের ছোবলে নির্জন জঙ্গলে মরতে হবে! কেউ টেরও পাবে না! নতুন-মা'র কাছে, বাবার কাছে খবরও পৌঁছবে না?

মোহন আর কিছু বলল না। বুঝতে পারল, বলেও কোন লাভ নেই। অন্য কোন ঘরে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা খুব সম্ভব বুড়ীরও নেই।

সে রুটি গুড় খাওয়া শেষ করে দেখল, দরজার গোড়ায় বসে বুড়ী চাল বাচছে। বোধহয় চোখে ভাল দেখতে পায় না, তাই চালের ওপর খুব ঝুঁকে পড়েছে।

মোহন ডাকল, দিদিমা, অ দিদিমা!

না, ছেলেটা জ্বালালে দেখছি! বুড়ী জিজ্ঞেস করল, কি বলবি বল?

আমি তোমার চাল বেছে দেবো দিদিমা ?

তুই কি করে বাছবি ? ঘরের মধ্যে তো অন্ধকার।

তোমার মতন দরজার গোড়ায় বসে !

দরজার গোড়ায় বসে ? না বাছা, মেঘা দেখলে রাগ করবে।

কোথায় পালাব দিদিমা, চারদিকে তো জঙ্গল। তাছাড়া কাছে তো তুমি বসেই রয়েছ।

বুড়ীটা কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, তা হলে আয় এখানে, চালগুলো বেছে দে। পালাবার চেষ্টা করলে খবরদার, একেবারে তোকে খতম করে দেবে। চারদিকে আমাদের লোক রয়েছে।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মোহন বুড়ীর পাশে গিয়ে বসল। বলল, সর দিদিমা, আমি বাচছি।

বুড়ী খুব একটা সরে বসল না। ছেলেটাকে হাতের নাগালের মধ্যে রাখাই ঠিক। কার কি মতিগতি হয় বলা যায়! অবশ্য পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। সে আশা দুরাশা। বাড়িতে শাঁখ আছে। সেই শাঁখে বুড়ী একবার ফুঁ দিলেই লোকেরা জঙ্গল ঘিরে ফেলবে। মাছিটির পর্যন্ত পালাবার পথ থাকবে না। সে কথাও বুড়ী জানিয়ে রাখল।

চাল বাছতে মোহনের বেশী সময় লাগল না। নতুন-মা'র কল্যাণে এসব কাজ তার জানা।

বুড়ী খুব খুশী। একগাল হেসে বলল, বা, খাসা হয়েছে। মেঘা আবার ভাতে একটু কাঁকর থাকলে খেতে পারে না। আমাকে গালাগালি করে। আমার কি আর সে চোখ আছে ?

মোহন বলল, তুমি রোজ আমাকে চাল বাছতে দিও দিদিমা, আমি বেছে দেবো।

বুড়ী একথায় সোজাসুজি কোন উত্তর দিল না, কিন্তু চোখ দেখে মনে হলো, খুশীই হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, হ্যাঁরে ছেলে, তোর বাড়িতে কে আছে ?

বাবা আছে। সংমা আছে !

সৎমা? তোকে ভালবাসে? আদর-যত্ন করে?

ছাই করে!

আহা-হা। খুব কষ্ট দেয় বুঝি।

মোহন কোন উত্তর দিল না। সে তখন অন্য কথা ভাবছে।

বুড়ী পাশে বসে। আচমকা যদি দু'হাতে বুড়ীর গলাটা চেপে ধরে! মারবে না। অজ্ঞান করে ফেলবে। তারপরই সে অনেক দূরে ওই যে একটা রাখাল ছেলে গরুর পাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছুটে তার কাছে চলে যাবে। গিয়ে বলবে, ভাই, আমাকে বাঁচাও। এই জঙ্গল থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দাও।

বুড়ী তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে। শাঁখে ফুঁ দেবে কি করে? শাঁখের আওয়াজ না পেলে মোহনের পালাবার খবর মেঘার লোকেরা পাবে কি করে?

হঠাৎ বুড়ীর কথায় মোহনের চমক ভাঙল, নে ওঠ, ঘরের মধ্যে যা। মেঘার আসার সময় হয়েছে।

মোহন উঠে পড়ল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মোহন বসে বসে ভাবতে লাগল, এভাবে তাকে আটকে রেখে এদের কি লাভ! কতদিন এভাবে রাখবে?

এবারে এরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, মোহনের বাবা আর টাকা দেবে না। মোহনকে উদ্ধার করার কোন ইচ্ছে তার নেই। কাজেই খাইয়ে-দাইয়ে মোহনকে কেন এরা বাঁচিয়ে রাখবে! এইবার একদিন খতম করে দেবে।

মোহন অপেক্ষা করতে লাগল।

যেমন করেই হোক পালাবার চেষ্টা করবে। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। যা করার তাকে নিজেই করতে হবে।

যদি ধরা পড়ে, এরা তাহলে হয়তো মেরে ফেলবে। তার জন্য মোহন প্রস্তুত।

॥ ছয় ॥

মোহনের বাবাকে চেনা যায় না। এই ক'মাসে যেন তার বয়স বেশ কয়েক বছর বেড়ে গেছে। মুখে হিজিবিজি আঁচড়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। কাজে তার মন নেই। কোনরকমে দোকান খুলে বসে।

পারিজাত বক্সি সবই লক্ষ্য করলেন। তাঁর সামনের চেয়ারে মোহনের বাবা চুপচাপ বসেছিল।

পারিজাত বক্সি বললেন, অভয়বাবু, আপনি অমন দমে যাবেন না। আমি বলছি, আপনার ছেলেকে ওরা মেরে ফেলেনি।

মোহনের বাবা আস্তে আস্তে মুখ তুলে করুণ গলায় বলল, প্রাণে হয়তো মারবে না, কিন্তু পঙ্গু করে দিয়েছে হয়তো। কিংবা যদি অন্ধ করে দিয়ে থাকে, তাহলেও আমার ছেলের অবস্থা ভেবে দেখুন।

কথাগুলো বলবার সময় মোহনের বাবার দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

পারিজাত বক্সি উঠে গিয়ে মোহনের বাবার পিঠে একটা হাত রাখলেন, আপনি ওভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না। আমি যা বলছি, তাই করুন।

কি বলুন ?

আপনি একটা চিঠি লিখে তিন মাস সময় নিন—সাত হাজার টাকা যোগাড় করতে কিছু সময় নেবে। অত টাকা হাতে নেই।

বেশ, তাই করব।

তাই করব নয়—এখনই করুন। আমি কাগজ এনে দিচ্ছি।

কাগজ-কলম এল।

পারিজাত বক্সি যেমন বললেন, মোহনের বাবা ঠিক তেমনই

লিখলেন।

লেখা শেষ হতে পারিজাত বক্‌সি আবার বললেন, আপনি চলে যান হাওড়া স্টেশনে। ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মে চিঠিটা ঘড়ির নীচে রাখবার কথা, তাই না?

মোহনের বাবা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

মোহনের বাবা বেরিয়ে যাবার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে এ-বাড়ি থেকে একজন চীনা ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল।

মাথায় টুপি। সামনের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। পরনে টাইট কোট-প্যান্ট।

একটু পরে হাওড়া স্টেশনে ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে চীনা ভদ্রলোককে দেখা গেল।

একটা খবরের কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরা।

মোহনের বাবা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আর সেখানে দাঁড়াল না।

কিছুক্ষণ কাটল।

একটা কুলি চিঠিটা তুলে নিয়ে চীনা ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে গেল।

খবরের কাগজের আড়াল দিয়ে চীনা ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সব দেখল।

বাইরে একটা ফেরিওয়ালা বসে ছিল। তার ডালায় বাদাম ভাজা।

কুলি চিঠিটা বাদামের ডালায় রেখে আবার স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মিনিট পনরো ফেরিওয়ালা চুপচাপ বসে রইল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

এইবার চীনা ভদ্রলোক চলতে আরম্ভ করল। হাওড়া স্টেশনের বাইরে মোটর সাইকেলের ওপর একটি ছোকরা বসে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েই মোটর সাইকেল চালিয়ে দিল।

রাস্তার এক পাশে কালো রংয়ের একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল।

চীনা ভদ্রলোক মোটরে উঠে মোটর চালু করল।

হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে মোটর সাইকেল ছুটল। পিছন পিছন মোটর।

এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর এক পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে মোটর সাইকেল থামল।

আরোহী নেমে কিছুক্ষণ একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কি করল, তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে গাছের কোটরে রেখে দিল। তারপর লোকটা আবার মোটর সাইকেলে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চীনা ভদ্রলোক মোটর থেকে নেমে এদিক ওদিক দেখল। তারপর এগিয়ে এসে এক ফাঁকে চিঠিটা তুলে নিল।

এটা মোহনের বাবার চিঠি, কিন্তু এ চিঠি নিতে তো কেউ আসছে না। খুব সম্ভব দিনের বেলা কেউ আসবে না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে এই ভাঙ্গা বাড়ির মধ্য থেকে লোক বেরিয়ে চিঠিটা নেবে। তাহলে ততক্ষণ তাকে কাছাকাছি অপেক্ষা করতে হবে!

চীনা ভদ্রলোক ভাঁজকরা চিঠিটা খুলেই চমকে উঠল। না, এটা তো মোহনের বাবার লেখা নয়। একই রংয়ের কাগজ, কিন্তু লেখা আছে—টিকটিকি সাবধান। পিছু ধাওয়া করে কোন লাভ হবে না।

আশ্চর্য, এ চিঠি কখন লিখল লোকটা?

তাছাড়া ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারে পারিজাত বক্সির খুব নাম ছিল, কিন্তু এ দলের চোখে ধুলো দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কি লজ্জার কথা!

মোটরে উঠতে গিয়েই পারিজাত বক্সি থেমে গেলেন। গাছের নীচে সাদা রংয়ের কী একটা পড়ে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে পারিজাত বক্সি সেটা তুলে নিলেন। রুমাল। চারধারে সবুজ বর্ডার।

সঙ্গে পুলিশের কুকুর থাকলে এই রুমালের গন্ধ শুঁকিয়ে লোকটার অনুসরণ করানো যেত। অবশ্য লোকটা এখন বহু দূর

সরে পড়েছে।

রুমালটা নিয়ে পারিজাত বক্‌সি মোটরে উঠলেন। বড় রাস্তায় পাশাপাশি হুটো লণ্ড্রি। মোটর সামনে রেখে পারিজাত বক্‌সি নামলেন।

লণ্ড্রির মালিক ভিতরে ছিল। পারিজাত বক্‌সি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

মালিক ভ্রূ কোঁচকাল।

আমার সঙ্গে ? আমার সঙ্গে কি কথা ?

পারিজাত বক্‌সি পকেট থেকে তাঁর নাম লেখা কার্ড বের করে মালিককে দেখালেন।

মালিক উঠে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার স্যর, আমার দোকানে আপনি কেন ? আমি তো সাদাসিধে লোক। কোন গোলমালে থাকি না।

পারিজাত বক্‌সি রুমালটা বের করে মালিকের টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন, কোণের দাগটা দেখে বলুন তো এটা পাড়ার কোন্ বাড়ির রুমাল !

মালিক রুমাল তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল। কোণে গুণ চিহ্নের মত দাগ। একটু দেখে নিয়ে সে বলল, এ দাগ আমাদের দোকানের নয়। আপনি পাশের দোকানে খোঁজ করুন।

রুমাল তুলে নিয়ে পারিজাত বক্‌সি পাশের দোকানের দিকে এগোলেন। দোকানের নাম পূর্ণিমা লণ্ড্রি।

একটি প্রৌঢ় বাইরে বসে আছে।

সেখানে গিয়েও নিজের নাম-লেখা কার্ড দেখিয়ে পারিজাত বক্‌সি রুমালটা বের করলেন।—দেখুন তো এটা কোন্ বাড়ির হতে পারে ?

একবার চোখ বুলিয়েই প্রৌঢ় লোকটি বলল, আরে, এ তো সদাশিববাবুর বাড়ির রুমাল।

কে সদাশিববাবু ?

সদাশিব পাল। চব্বিশ নম্বর বাড়ি।

আপনি চেনেন তাঁকে ?

সে কি মশাই, আমার দশ বছরের খদ্দের। আমি চিনব না ?

কি করেন তিনি ?

ব্যবসা আছে। তেঁতুলের ব্যবসা।

পারিজাত বক্সি আর দাঁড়ালেন না। রাস্তায় নেমে এলেন। যেটুকু খবর পেয়েছেন লণ্ড্রি থেকে, এর বেশী কিছু যোগাড় করা সম্ভব নয়।

হনহন করে এগিয়ে পারিজাত বক্সি চব্বিশ নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছুলেন।

টিম টিম করে জ্বলছে ইলেকট্রিকের আলো। তার নীচে একটি প্রৌঢ় বিরাট খাতা খুলে কি সব হিসাবপত্র করছে।

পারিজাত বক্সিকে ঢুকতে দেখে প্রৌঢ় মুখ তুলল। কে ? কি চাই আপনার ?

আপনি কি সদাশিববাবু ?

হ্যাঁ।

দেখুন তো এ রুমালটা কি আপনার ?

আপনার মাথা খারাপ! ওই রকম বর্ডার দেওয়া রুমাল এ বয়সে আমি ব্যবহার করব ? তাছাড়া আমি রুমাল ব্যবহারই করি না।

এখানে আর কে থাকে ?

কে থাকবে! আমি আর তেঁতুলের বস্তা থাকি।

আমি এ গুদামঘর সার্চ করব।

আপনি কে মশাই সার্চ করবার ? আপনাকে আমি সার্চ করতে দেবোই বা কেন ?

ঠিক আছে। যাতে দেন সে ব্যবস্থা করছি। কথাটা বলেই পারিজাত বক্সি সমস্যায় পড়লেন। যদি এখন তিনি সার্চের ব্যবস্থা করতে থানায় যান, তাহলে সদাশিববাবু হয়তো সেই ফাঁকে কাজ গুছিয়ে রাখবে। কিন্তু ওয়ারেণ্ট ছাড়া সার্চ করাও সম্ভব নয়।

হঠাৎ পারিজাত বক্সির খেয়াল হলো। তাঁর মোটরের মধ্যেই

তো সব বন্দোবস্ত রয়েছে। সেখান থেকে কাছের থানায় সবকিছু জানাতে পারবেন।

তাই হলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে থানার দারোগা দু'জন পুলিশ নিয়ে হাজির। সঙ্গে সার্চ ওয়ারেণ্ট।

প্রথমে একতলাটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। তেঁতুলের বস্তা, দাঁড়িপাল্লা, হিসাবের খাতাপত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

সকলে ওপরে উঠল। দোতলায় সারি সারি ঘর।

কোন ঘরে কিছু নেই, শুধু শেষের দিকের একটা ঘরে একটা ছোট ছেলের নীল প্যাণ্ট। পাশে একটা চাবুক।

পারিজাত বক্সি প্যাণ্ট আর চাবুক দুটোই তুলে নিলেন। প্যাণ্টে অল্প অল্প রক্তের দাগ।

এ প্যাণ্ট কার ?

কি করে জানব বলুন! এখন বাজার খুবই খারাপ। ওপরতলায় তেঁতুলের বস্তা রাখার আর দরকার হয় না। আমি দোতলায় আসিই না।

কিন্তু এসব কামরা দেখে তো মনেই হচ্ছে না যে, কোনদিন এখানে তেঁতুলের বস্তা রাখা হতো।

এবার সদাশিববাবু রেগে উঠল। আপনার মনে না হলে আর কি করতে পারি বলুন! আমার হিসাবের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

পারিজাত বক্সি আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত সদাশিববাবু। কিছু মনে করবেন না। আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে গেলেন।

রাত নেমে এলে গলিটা যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তখন একটি ছায়ামূর্তি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে এল।

ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছ। চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক

দেখে ছায়ামূর্তি তরতর করে ওপরে উঠে গেল। এক ডাল থেকে অন্য ডালে।

মোটা একটা ডাল দোতলার জানলা পর্যন্ত এসেছে। মূর্তিটা ডাল আঁকড়ে চুপচাপ পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

পাশের বাড়ি অন্ধকার। কোথাও আলোটালো নেই। চারদিকে ঝিঁঝি ডাকছে। দূরে দূরে পথের কুকুরের চীৎকার। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ টুং টুং করে আওয়াজ।

রাত কত বোঝবার উপায় নেই। মূর্তি ঝুঁকে পড়ে দেখল। এঁকেবেঁকে একটা সাইকেল এসে গাছের নীচে দাঁড়াল।

আরোহী ওপর দিকে চোখ ফেরাতেই দোতলার একটা জানলা থেকে একটা টর্চের আলো দপ দপ করে তু'বার জ্বলেই নিভে গেল। বোঝা গেল, কোন রকম সংকেত।

তারপর সাইকেল নিয়ে আরোহী ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দোতলার একটা ঘরে অল্প জোরালো একটা বাতি জ্বলে উঠল।

ছায়ামূর্তি আরো সরে এসে জানলার ধারে বসল।

কামরার মধ্যে সদাশিব আর মোটর-সাইকেল আরোহী। এই লোকটাই প্লাটফর্ম থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিল।

সদাশিব লোকটাকে খিঁচিয়ে উঠল, তুই কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছিস বিনোদ ?

কেন, কি হলো ?

কি হলো ? পকেট থেকে রুমালটা রাস্তার ওপর ফেলে গেছিস। সেই রুমালের মার্কা ধরে টিকটিকি এসে হাজির।

বিনোদ একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, সেইজন্যই রুমালটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম কোথায় পড়ে গেল। তারপর কি হলো ?

হবে আবার কি ! বাড়ি তো খালি। সব তো সর্দার সরিয়ে দিয়েছে।

হুঁ, আমিও টিকটিকিকে খুব ধোঁকা দিয়েছি। আমি জানতাম,

ওই ছেলেটার বাপ সব কাজ টিকটিকিকে জানিয়ে করছে। টিক-টিকি ঠিক আমার পিছু নেবে। তাই আমি একটা চিঠি তৈরি করে পকেটে নিয়ে রেখেছিলাম। সুযোগ বুঝে অশথগাছের তলায় সেটা রেখে দিয়েছিলাম।

যাক, সর্দার কি বলে ?

সর্দারের ইচ্ছা, অপেক্ষাই করা যাক।

কি জানি, তার চেয়ে ছেলেটাকে অন্ধ করে দিয়ে কিংবা পা দুটো খোঁড়া করে দিয়ে আয় বাড়াতে পারলেই ভাল হতো।

সর্দারের ধারণা, ছেলেটার বাপ ইচ্ছে করলে টাকা দিতে পারে। গাঁয়ের লোকের কাছে খবর পেয়েছে, বাপ ছেলেকে ভালবাসে। কাজেই একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু দেবে টাকাটা ঠিক। অবশ্য টাকাটা পেলেই যে ছেলেকে ছাড়া হবে এমন কোন কথা নেই।

ছায়ামূর্তি বসে বসে ভাবল। এই সময় আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে এই দু'জন লোককে সহজেই গ্রেপ্তার করা চলে, কিন্তু তাতে আসল কাজ হবে না। তা ছাড়া এদের বিরুদ্ধে প্রমাণই বা কি !

সব ব্যাপারটাই এরা বেমালুম অস্বীকার করে বসবে। তবে এই সদাশিব লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। তেঁতুলের কারবার যে তার স্রেফ বাইরের সাজানো ব্যাপার, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। সাইকেল চড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার বেশ কিছুক্ষণ পর ছায়ামূর্তি নামল। এদিক-ওদিক দেখে, খুব সাবধানে। কিন্তু একটু এগিয়েই মুশকিলে পড়ল।

একটা কুকুর ঘুমোচ্ছিল। তার পা গিয়ে পড়ল একেবারে ঘুমন্ত কুকুরের ওপর।

ভাগ্য ভাল, কুকুরটা কামড়ায়নি কিন্তু বিকট শব্দে চীৎকার শুরু করল।

কান পাতা দায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বেঁটে মোটা একটা লাঠি এসে পড়ল ছায়ামূর্তির পায়ে। ছায়ামূর্তি পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

একবার মনে হলো, একটা হাঁটুর হাড় বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর জীবনে উঠে দাঁড়াতেই পারবে না।

এক সময় অনেক কষ্টে ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল।

টলতে টলতে কয়েক পা যেতেই আবার বিপদ। পেছন থেকে কে একজন তাকে সজোরে জাপটে ধরল। আর একজন রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে একেবারে কাঁধের ওপর তুলে নিল।

কিছু দূরেই একটা মোটর দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে ছায়া-মূর্তিকে পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিল।

চীৎকার করার সুযোগ নেই। শুধু দুটো হাত খোলা। দুটো পা-ই শক্ত করে বাঁধা।

খোলা হাত দিয়ে ছায়ামূর্তির কিছু করার নেই।

তার পায়ের কাছে একজন বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে তার হাতে কালো মোটা একটা লাঠি। এটা ছুঁড়েই বোধহয় ছায়ামূর্তির পা জখম করেছিল। একটু বেচাল দেখলে হয়তো লাঠি দিয়ে সোজা মাথাতেই আঘাত করে বসবে।

ছায়ামূর্তি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল। বুঝতে পারল, মোটর তীরবেগে ছুটে চলেছে।

অনেকক্ষণ। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে।

ছায়ামূর্তি মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখে নিচ্ছিল।

এক সময়ে মোটর থামল। দু'জন লোক ধরাধরি করে ছায়া-মূর্তিকে নামিয়ে আনল। একটা খাটিয়ার ওপর তাকে শুইয়ে লোক দু'জন চৌকাঠের বাইরে বসল।

এখন বেশ আলো ফুটেছে। কোথাও কোন অন্ধকার নেই।

এবার ছায়ামূর্তিকে চেনা গেল। ছায়ামূর্তি পারিজাত বক্সি স্বয়ং।

পারিজাত বক্‌সি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন। বাইরে থেকে লোক দুটোর কথাবার্তা তাঁর কানে ভেসে এল।

তুই তাহলে থাক এখানে। লোকটাকে পাহারা দে। আমি চলি।

কোথায় যাবি তুই ?

তারক গাড়ি নিয়ে শহরে গেছে, যদি সর্দারকে পায় ওখানে। আমি একবার মান্দারনপুর ঘুরে আসি মেঘার ওখানে। যদি সর্দার ওখানে গিয়ে থাকে। সেই ছেলেটাকে মেঘার কাছে রাখা হয়েছে কিনা।

কি করতে যে ছোকরাটাকে কইমাছের মতন জিইয়ে রেখেছে কে জানে ? শেষ করে দিলেই আমাদের হয়রানি কমে।

যাক, ও-সব উঁচুতলার ব্যাপার আমাদের ভেবে লাভ নেই। তুই ভেতরে গিয়ে ওর অবস্থাটা দেখে আয়, তারপর বাজারে গিয়ে খেয়ে নিয়ে আবার পাহারায় বসবি।

লোকটার পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই পারিজাত বক্‌সি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ।

লোকটা ঝুঁকে পড়ে একবার দেখল। নাকের তলায় হাত দিল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, না রে, এখনো দেখছি জ্ঞান ফেরেনি। এসব শহরের ফুলবাবু তো, ভয়েই বোধহয় সিঁটিয়ে গেছে।

আর একজন বলল, এত ভয় তো এসব কাজে আসা কেন ?

পয়সা ভাই, পয়সা। সবই পেটের জন্য। আমাদের কথাই ভাব না। যাক চল, দরজা বন্ধ করে বের হয়ে পড়ি।

বাইরের দরজায় তালা দেওয়ার শব্দ হলো।

তারপরও কিছুক্ষণ পারিজাত বক্‌সি চুপচাপ শুয়ে রইলেন। অনেকটা সময় কাটিয়ে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন।

মাটির দেয়াল। টিনের চাল। একটি জানলা, একটি দরজা। দরজা-জানলা ঘরের তুলনায় বেশ মজবুত।

কোনমতে খাটিয়াটা ঠেলে ঠেলে তিনি জানলার কাছে নিয়ে এলেন। হাত তুটোও এবার বেঁধেছে।

চারিদিকে ধু ধু মাঠ। কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নেই।

পারিজাত বক্সি খাটিয়ায় শুয়ে তুটো পা জানলার মধ্যে গলিয়ে দিলেন। মরচে পড়া গরাদ প্রায় লাল হয়ে রয়েছে। দড়ির বাঁধন সেই গরাদের গায়ে ঘষতে লাগলেন।

পা তুটো টনটন করছে। বেশ ব্যথা রয়েছে, কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না।

ঘষতে ঘষতে এক সময় বাঁধন ছিঁড়ে গেল। হাতের বাঁধনও একইভাবে খোলা হলো। পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন। ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যে। পায়ে ব্যথা রয়েছে বটে, কিন্তু এ নিয়ে চলাফেরা করতে পারবেন।

প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, রিভলবারটি ঠিক আছে। এটার অস্তিত্ব কেউ টের পায়নি। কাল এটা ব্যবহার করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করলেই লোকগুলো হয়তো তাকে শেষ করে দিত।

পারিজাত বক্সি উঠে দরজার কাছে গেলেন। টেনে দেখলেন, মোটা একটা চেনের সঙ্গে বাঁধা।

এ দরজা দিয়ে বের হবার কোন আশা নেই। পারিজাত বক্সি খাটিয়ায় ফিরে এলেন। চুপচাপ শুয়ে ভাবতে লাগলেন।

যেমন করেই হোক এ কেস্‌টার একটা কিনারা করতেই হবে। দলটা বারবার তার চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছে।

আর একটা ব্যাপার, কেউ যেন চুপি চুপি তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। প্রত্যেকবার তাঁর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে।

দরজায় শব্দ হতেই পারিজাত বক্সি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

তালা খুলল। কে একজন যেন ঢুকল। খাটিয়ার কাছ বরাবর এসে বলল, এ কী রে বাবা, লোকটা এখনো চুপচাপ পড়ে আছে! শেষ হয়ে গেল নাকি?

লোকটা পারিজাত বক্সির গায়ে ঝুঁকে পড়তেই পারিজাত

বক্‌সি প্রবল বেগে ঘুষি চালালেন লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে।

বাপস্। বলে লোকটা ছিটকে দেয়ালের কোণে গিয়ে পড়ল।

পারিজাত বক্‌সি এক মুহূর্তও নষ্ট করলেন না। পকেট থেকে রিভলবার বের করে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, খবরদার, একটু চেঁচালেই খুলি ফুটো করে দেবো।

লোকটা চেঁচাবে কি, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে!

হাতের এত শক্তি তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। চোয়ালে ঘুষি খেয়ে তখনো সে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

উঠে দাঁড়াও!

লোকটা দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। তার পরনে পাতলা একটা গেঞ্জি আর ফুলপ্যান্ট। প্যান্টের পেছনে পকেট।

দুটো হাত ওপরে তোল।

লোকটা হাত তুলল।

পারিজাত বক্‌সি প্যান্টের পকেট দেখল। একটা চামড়ার মানিব্যাগ, তাতে চার টাকা ত্রিশ পয়সা। আর আধময়লা একটা বড় রুমাল।

ব্যাগটা আবার রেখে দিয়ে পারিজাত বক্‌সি বললেন, মেঘা কে?

লোকটা কিছুক্ষণ চোখ পিট পিট করে বলল, আমাদের দলের একজন।

মোহন বলে একটা ছেলেকে ধরে এনে কোথায় রেখেছ?

ও নামে কাউকে জানি না।

মেঘার কাছে কে আছে তাহলে?

নতুন ছেলে একটা।

তার নাম কি?

জানি না।

এসব ছেলেদের নিয়ে কি করা হয়?

জানি না।

সোজা উত্তর না দিলে অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

মা কালীর দিব্যি, জানি না। আমাদের কাজ শুধু টিকটিকি আগলানো। বলেই লোকটা জিভ কাটল।

পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন, লোকটার কাছ থেকে এর বেশী আদায় করা যাবে না।

পিছন ফেরো।

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

পারিজাত বক্সি পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করে লোকটার দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধলেন। তারপর তাকে টানতে টানতে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে ফেললেন। তারপর পা দুটোও বাঁধলেন।

রুমাল বের করে তার মুখে এমন ভাবে গুঁজে দিলেন, যাতে লোকটার দুটো চোখ ছানাবড়ার মতন বেরিয়ে এল।

পারিজাত বক্সি হেসে বললেন, এইভাবে শুয়ে থাক। আমি চলি।

বাইরে বেরিয়ে চেনে তালা লাগিয়ে দিলেন। চাবি তালাতেই ঝুলছিল।

প্রথমে চলতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছিল। উঁচু-নীচু জমি, তারপর পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল।

চলতে চলতে পারিজাত বক্সি ভাবলেন, একটা ভুল হয়ে গেল। এখান থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে নিলে হতো। কোনদিক দিয়ে গেলে সোজা হবে কে জানে!

তারপর আবার তাঁর মনে হলো, কিছু বলা যায় না, জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে উল্টো পথই বাতলে দিত। যাতে সারাক্ষণ কেবল মাঠে মাঠেই ঘুরতে হতো। ইতিমধ্যে সঙ্গীরা এসে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করত।

অনেকটা যাবার পর পারিজাত বক্সি দেখলেন, শাক-সব্জি মাথায় নিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে।

ও কত্তা, একটা কথা শোন।

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখান থেকে রেল স্টেশন কোনদিকে ?

লোকটা অবাক হয়ে গেল।

রেল স্টেশন ? এদিকে ওসব নেই।

তাহলে বাইরের লোকেরা যাওয়া-আসা করে কিসে ?

বাবুরা হাওয়া গাড়িতে আসে, আর সবাই আসে খেয়া পার হয়ে।

খেয়াঘাট এখানে কোথায় ?

এখান থেকে দেড় ক্রোশ। ওই ওদিকে।

পারিজাত বক্‌সি এগিয়ে চললেন।

রোদ বাড়ছে। বেশ তাপ। চলতে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাস্তার দু' পাশে বাবলা গাছ। তার তলায় মোটেই ছায়া নেই।

অনেকটা পথ গিয়ে খেয়াঘাট নজরে এল।

নদীর ধারে সারি সারি অনেকগুলো চালাঘর। দুটো চায়ের দোকান, একটা কবিরাজখানা আর একটা চুল কাটার সেলুনও আছে সেখানে।

পারিজাত বক্‌সি প্রথমে চায়ের দোকানে ঢুকলেন। খিদে তো পেয়েইছে, তার ওপর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

পারিজাত বক্‌সি চা আর বিস্কুটের অর্ডার দিলেন। এ ছাড়া অবশ্য কেক ছিল, কিন্তু কেকের অবস্থা দেখে আর খাবার ইচ্ছা হলো না।

দু'কাপ চা আর গোটা আষ্টেক বিস্কুট খেয়ে পারিজাত বক্‌সি অনেকটা ধাতস্থ হলেন। তারপর গিয়ে ঢুকলেন কবিরাজের দোকানে।

একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে। মাথায় সাদা ধবধবে চুল, পাকা পাকা গোঁফ। তাকে পা দুটো দেখালেন।

কি করে হলো ? খুব ব্যথা কি ? দাঁড়ান ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।

সব বুড়ো মানুষের মতন কবিরাজ একটু বেশী কথা বলে,

সেটা বোঝা গেল। ওষুধ লাগানো হতে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এ জায়গার নাম কি ?

বাজে মল্লিকপুর।

মান্দারনপুর এখান থেকে কত দূর ?

কবিরাজ ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

মান্দারনপুর বলে তো এদিকে কোন জায়গা নেই। এক মান্দারনপুর আছে, খেয়া পার হয়ে রেলে করে যেতে হয়। যেখানে চণ্ডেশ্বরীর মন্দির আছে। বাবার কাছে শুনেছিলাম, অনেক আগে খুব ধুমধাম করে পুজো হতো। মেলা হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেন, সেখানে আপনার কি দরকার ?

আমার কিছু পৈতৃক জমি ছিল। সেগুলো দেখাশুনো করতে যাব।

অ। কবিরাজ টেবিলের ওপর রাখা একটা খবরের কাগজে মন দিল।

আচ্ছা, খেয়া নৌকা কখন আসবে ?

কবিরাজ মুখ তুলে দেখে বলল, ওই তো আসছে।

মাঝ-নদীতে একটা নৌকা। যাত্রী বোঝাই। এদিকেই আসছে।

পারিজাত বক্সি সাবধানে নেমে খেয়াঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আরও কয়েকজন যাত্রী মোটঘাট নিয়ে বসে আছে। সবাই প্রায় চাষাভুষো শ্রেণীর।

এ নৌকা যেখানেই যাক, এ জায়গা পারিজাত বক্সিকে ছাড়তেই হবে। শয়তানের দল হয়তো তার সন্ধানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এবার ধরলে আর এত সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

নৌকা পারে এসে লাগল।

॥ সাত ॥

সেই রাত্রেই এক ব্যাপার।

সারাটা দিন মোহনকে খাটতে হয়েছে। সকালে মেঘা দরজা খুলে বলেছে, ভারি আমাদের রাজপুত্তুর এসেছেন! আমরা কেবল ওঁর সেবা করব। নে ওঠ।

ভয়ে ভয়ে মোহন উঠে পড়েছে।

আধপোড়া রুটি আর গুড় খাওয়া হতে, মেঘা তার হাতে একটা মাটির ঘড়া তুলে দিয়ে বলেছে, ওই পুকুর থেকে জল তুলে আমার বাগানে দে। কাজ কর। বসে থেকে থেকে হাত-পায়ে মরচে ধরে যাবে যে।

মোহনের প্রথমে ধারণা হয়েছিল, বার দুই-তিন জল ঢাললেই বুঝি কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ডোবার পাশেই মেঘার বেগুন ক্ষেত। একটা খাটিয়া নিয়ে মেঘা বেগুন ক্ষেতের পাশে বসল। হাতে হুঁকো। কাজের তদারকি করাও হবে, আবার ছেলেটাকে নজরেও রাখতে পারবে।

তালগাছের লম্বা সিঁড়ি। ভীষণ পিছল।

শ্যাওলা সরিয়ে ঘড়াতে জল ভরতে হবে, তারপর সেই ভারি ঘড়া বয়ে এনে বেগুন ক্ষেতে জল দেওয়া।

একটু দেরি হলেই মেঘার বজ্রকণ্ঠের চীৎকার, কি রে, মরলি নাকি। উঠব একবার?

প্রায় টানা দু' ঘণ্টা।

মেঘা যখন বলল, ব্যস, আজ এই পর্যন্ত, তখন মোহনের দুটো হাত তুলবার ক্ষমতা নেই। কাঁধ পর্যন্ত টনটন করছে।

মনে মনে মোহন ভাবল, হায় রে, সৎমার কয়েকটা ফাই-ফরমাশ খাটবার ভয়ে দেশে কত কাণ্ড করেছে, অথচ এ খাটুনির তুলনায়

সে তো কিছুই নয়। রোজ যদি এইরকম খাটতে হয়, তাহলে কারুর আর মোহনকে মারবার প্রয়োজন হবে না। সে এমনিতেই মরে যাবে।···

শেষবেলার দিকে চাটাইয়ের ওপর মোহন টান হয়ে শুয়েছিল, মেঘার মা এসে বলল, নে, উঠে চাল ক'টা বেছে দে, ছেলেমানুষ কি ওরকম শুয়ে থাকে ?

ফলে রাতে যখন মোহন শুতে গেল, তখন তার গায়ে একটুও শক্তি নেই। চাটাইয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুম এসে গেল।

তারপর মাঝরাতে হঠাৎ কিসের শব্দ। একেবারে মোহনের কানের পাশে।

মোহন ক্লান্ত চোখ দুটো খুলে যা দেখল, তাতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

সারা ঘর জুড়ে গোটা চারেক সাপ। দুটো বড়, দুটো ছোট। ফণা তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঝের ওপর ছোবল দিচ্ছে। বোধহয় এটাই খেলা। সেই সময় হিস্ হিস্ আওয়াজ হচ্ছে। ছোটগুলোর গর্জন আরো বেশী।

মোহন শুয়েছিল, নড়াচড়া করলেই সাপের নজরে পড়ার সুযোগ বেশী, কিন্তু এতগুলো সাপের এত কাছাকাছি সে চুপ করে শুয়ে থাকবেই বা কি করে ?

মোহন মরীয়া হয়ে দরজার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলল।

মেঘার মা কুপি হাতে দরজা খুলেই গালাগাল শুরু করল, এ তো আচ্ছা জ্বালাতন! রাত্তিরেও একটু চোখ বোজবার উপায় নেই। কি হলো কি, বল ? আপদ এসে জুটেছে এক !

মোহনের সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। কথা বলবার শক্তি নেই। কোন রকমে উচ্চারণ করল, সাপ, অনেকগুলো সাপ। দিদিমা বাঁচাও।

মেঘার মা যখন ঘরের দিকে তাকাল, দেখল সাপগুলো এক

কোণে সরে গেছে। কিছুটা কুণ্ডলী পাকিয়ে একটু ফণা উঁচু করে রয়েছে। বোধহয় দরজার আওয়াজে তারাও একটু ভয় পেয়েছে।

মেঘার মা সব দেখে নিয়ে বলল, তোকে না বলেছি, ওসব বাস্তুসাপ, কোন ক্ষতি করবে না। তবু মাঝরাত্তিরে চেঁচাবি ?

মোহন দু'হাতে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, আমার বড় ভয় করছে দিদিমা। আমি এ ঘরে শুতে পারব না।

শোন কথা ছেলের! এ ঘরে শুবি না তো কোথায় শুবি ? বুড়ির গলা যেন শেষদিকে একটু নরম হয়ে এল।

মোহন উত্তর দিল না।

বুড়ি কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে, চল শুইগে।

চাটাইয়ে পাশাপাশি দু'জনে শুলো।

মোহনের তখনি ঘুম এল না, কিন্তু বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

মোহন চোখ ঘুরিয়ে দেখল। আশ্চর্য কাণ্ড। সাপগুলো কোথাও নেই। বোধহয় ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেছে।

হঠাৎই মোহনের মনে কথাটা এল। এই তো সুযোগ। বুড়ি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলা। এখন কোনরকমে বের হতে পারলে রাতের অন্ধকারে অনেকটা পথ পালানো যাবে।

চারদিকে বেশ জঙ্গল। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক মোহনের কানে এসেছে। আরও হিংস্র কোন জন্তু আছে কিনা তার জানা নেই।

জন্তু-জানোয়ারের কবলে পড়বে কিনা কে জানে। যাই কিছু হোক, এমন সুযোগ হারানো উচিত হবে না।

আস্তে আস্তে মোহন উঠে বসল। না, বুড়ি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। নাকের গভীর গর্জন।

মোহন দাঁড়াল। কুপির আলোয় ঘুমন্ত বুড়িকে বীভৎস দেখাচ্ছে।

কিন্তু মেঘা নিশ্চয় বাড়িতেই আছে। মোহনকে বের হতে

দেখলে লাফিয়ে এসে টুঁটি চেপে ধরবে। দেখাই যাক। কপালে যা আছে হবে!

মোহন আর এভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে মিশকালো অন্ধকার। একহাত দূরের কিছু দেখার উপায় নেই। মাঝে মাঝে শুধু ঝোপের ফাঁকে জোনাকির আলো। নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। মোহনের গা ছমছম করে উঠল।

পিছন ফিরে মোহন একবার দেখল, বুড়ি ঘুমোচ্ছে। দুটো সাপ ফাটল থেকে বের হয়ে মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মোহন আর অপেক্ষা করল না। বাইরে পা বাড়াল। তার মনে আছে, তিনটে সিঁড়ির ধাপ; তারপরই মাটি।

মাটিতে পা রেখে একটু দাঁড়াল সে। কোনদিক থেকে এখানে এসেছিল আন্দাজ করার চেষ্টা করল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তা সম্ভব হলো না।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ঠিক হবে না। মোহন ছুটতে আরম্ভ করল।

উঁচু-নীচু জমি। অন্ধকারে কাঁটাঝোপকে আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। অনেকবার মোহন ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল। কাঁটার আঘাতে গা ক্ষতবিক্ষত হলো। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, দু'জায়গায় বোধহয় রক্তও বেরিয়েছে।

অনেকটা ছোটার পর চোখের সামনে একটা দৃশ্য দেখে মোহনের রক্ত হিম হয়ে গেল।

দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। অন্ধকারে জন্তুদের চোখ ঠিক এমন করেই জ্বলে।

নীল আর হলদে মেশানো আলো। দেশের বাড়িতে আচমকা ঘুম থেকে উঠে কত রাতে জানলা দিয়ে দেখেছে, উঠোনে অনেকজোড়া এই ধরনের চোখ ঘোরাফেরা করছে।

মোহন জানত, সে-সব শেয়ালের চোখ। পুকুরের পাশে

বাঁশবনের মধ্যে শেয়ালের গর্ত। রাত হলেই তারা দলে দলে বেরিয়ে আসে। লোকেদের উঠোনে হাঁস-মুরগির লোভে ঘোরাফেরা করে।

জঙ্গলের মাঝখানে এভাবে তাদের মুখোমুখি মোহনের কোনদিন দাঁড়াতে হয়নি। শেয়াল কামড়ায় একথা শুনেছে। তাদের গাঁয়ে কা'কে একবার কামড়েছিল।

মোহন মাটিতে বসে পড়ল। দু'হাতে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিল। তারপর সেই চোখ লক্ষ্য করে ঢেলাগুলো ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

অনেকগুলো লাগল না, তবে চোখের আলো এদিক-ওদিক সরে গেল। তারপর একটা ঢিল লাগতেই ঘেউ করে একটা শব্দ হলো।

মোহন একটু নিশ্চিন্ত হলো। অন্য জন্তু নয়, কুকুর। কিন্তু বুনো কুকুর যদি হয়, তাহলে মোহন ছুটলেই তো তেড়ে এসে কামড়াতে পারে।

মোহন কিছুটা পথ আস্তে আস্তে হেঁটে পার হলো। তারপর আবার ছুটতে লাগল।

অনেকটা সময় কাটল। মোহনের মনে হলো, আর সে পারবে না, এবার সে মাঠের ওপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়বে। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা হাত-পায়ে, গাঁটে-গাঁটে। কপালটা কেটে গিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়।

ঠিক এই সময়ে চোখে পড়ল, বেশ একটু দূরে কয়েকটা আলো জ্বলছে। তার মানে গ্রাম। কোনরকমে ওখানে পৌঁছুতে পারলে একটা আশ্রয় মিলতে পারে। তবে ও গ্রামও খুব কাছে মনে হলো না।

মোহন একটু দম নিয়ে দ্বিগুণ বেগে ছুটতে লাগল। আলো লক্ষ্য করে।

কয়েক পা মাত্র গিয়েছে, এমন সময় চারিদিক কাঁপিয়ে শাঁখের শব্দ। এরকম বুক কাঁপানো শাঁখের শব্দ মোহন এর আগে আর

শোনেনি। আওয়াজে বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল।

একটু পরেই এদিকে ওদিকে মানুষের হাঁক-ডাক। মশালের আলো জ্বলে উঠল। মোহন সামনের একটা গাছে উঠে পড়ল। ওঠবার সময় হাত-পা আবার নতুন করে ছড়ল। বেশ ঝাঁকড়া গাছ। পাতাব আড়ালে লুকোবার খুব সুবিধা।

মোহন দেখল, প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা মশাল চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার আর নেই। দিনের আলোর মতন সব পরিষ্কার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মশালগুলো খুব কাছে এগিয়ে এল। কালো কালো ষণ্ডামার্কা লোক। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। খালি পা। মশালগুলো উঁচুতে তুলে ধরে গাছের ওপরে পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

গাছের ডালে বসে মোহন থরথর করে কাঁপতে লাগল। এবার ধরা পড়লে এরা বোধহয় মশালের আগুনেই পুড়িয়ে মারবে।

মোহন যে গাছের ওপরে ছিল, তার তলায় তিনজন লোক এসে দাঁড়াল। তিনজনই হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে তাদের গা।

একজন বলল, তাই তো, শয়তানটা গেল কোথায় ?

আরেকজন বলল, ঝোপে-ঝাড়ে নিশ্চয় কোথাও বসে আছে। যাবে কোথায় ? গাঁ এখান থেকে সাত ক্রোশ। তৃতীয়জন বলল, যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে সর্দার আমাদের কারো ঘাড়ে মাথা রাখবে না।

চল, ওদিকটা দেখি। এগুতে যাবার মুখেই একজন থেমে গেল। মশালটা আবার উঁচু করে বলল, ও রে, ওই পাতার আড়ালে দেখ, কি একটা নড়ছে !

বাকি দু'জন তাদের মশাল তুলে ধরল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওই তো।

মোহনের হাত-পা অবশ হয়ে গেল। তার মনে হলো পাকা ফলের মতন টুপ করে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়বে।

এই, ভালোয় ভালোয় নেমে আয় বলছি, না হলে গাছে আগুন

ধরিয়ে দেবো। জ্যান্ত পুড়ে মরবি।

এরা না পারে এমন কাজ নেই। আস্তে আস্তে মোহন নেমে আসতে লাগল।

পুরোপুরি নীচে পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে হলো না। যখন সে মাটি থেকে হাত পাঁচ-ছয় উঁচুতে, তখন একজন তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল। নামিয়েই প্রচণ্ড এক চড়।

লোকটা ধরে না থাকলে মোহন ঘুরে পড়েই যেত।

লোকটা বলল, খুব বেশী ওস্তাদ হয়ে গেছিস, না? আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা?

আরেকটা লোক বলল, উঃ, কম হয়রানি হয়েছে আমাদের!

আর একজন মোহনের চুলের মুঠি ধরে জোর টান দিল।

যন্ত্রণায় মোহন কঁকিয়ে উঠল।

যে লোকটা মোহনের হাত ধরেছিল, সে তাকে কাঁধে ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করল।

মোহনকে যখন ওরা বন্দী করে নিয়ে আসছে, তখন অনেকে মেঘার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল।

একপাশে মেঘার বুড়ি মা হাঁউমাউ করে কাঁদছে। তার সামনে মেঘা।

মেঘার মা বলছিল, উঃ, কি সর্বনেশে ছেলে বাবা! আমি কাছে যেতেই আমার গলা টিপে ধরল। এত জোরে যে, আমি চোখে অন্ধকার দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সেই ফাঁকে ছেলেটা হাওয়া।

মেঘা ধমক দিয়ে উঠল, থাম থাম, আর কাঁদতে হবে না। ও যাবে কোথায়? লোকেরা ঠিক ওকে ধরে নিয়ে আসবে।

মেঘার মা কিন্তু থামল না। সে বলতে লাগল, তারপর ঘোর কাটতেই আমি উঠে শাঁখটা বাজিয়ে দিলাম।

মেঘার মাকে আর বলতে হলো না। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

মেঘা বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল, পাওয়া গেছে? কই, কোথায়?

কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। ততক্ষণে মোহনকে নিয়ে সেই লোক তিনটে কাছে এসে নামিয়ে দিয়েছে।

মেঘার বুড়ি মা আবার হাত নেড়ে নেড়ে তার গলা টিপে ধরার মিথ্যা কাহিনীটা বর্ণনা করতে শুরু করল।

মেঘা তখন সোজা মোহনের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

মোহন মাটিতে পড়ে আছে। তার ওঠবার ক্ষমতা নেই।

যাক, সর্দারের কাছে মুখরক্ষা হলো। আজই সর্দারের আসবার কথা। শয়তানটাকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখ। ওর শাস্তি সর্দারই দেবে। তোরা সব ভোরের দিকেই এখানে চলে আয়। খুব জরুরি কাজের জন্য সর্দার ডেকে পাঠিয়েছে। এখন অনেক রাত হয়েছে, একটু চোখ বুজে নিই।

হাই তুলে মেঘা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। পিছন পিছন মেঘার মা।

নে ওঠ। সেই লোকটা মোহনকে টেনে দাঁড় করাল, চল।

মোহন চলতে গিয়ে বুঝতে পারল তার আর চলবার শক্তি নেই। ছটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। যন্ত্রণায় পা ফেলতে পারছে না। তবু সে কোনরকমে টলতে টলতে চলতে লাগল।

আবার সেই পুরনো ঘর পুরনো চাটাই। তার মধ্যে মোহনকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালাবন্ধ হয়ে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে মোহন গিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে মা, মাগো—করুণ সুর বেরুল।

এতদিন পর নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল তার। পৃথিবীতে যার নিজের মা নেই, তার বুঝি কেউই নেই। সারা পৃথিবী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আজ মোহনের নিজের মা বেঁচে থাকলে তাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হতো না। বাড়ি থেকে পালাবারই কোন প্রশ্ন উঠত না।

সকালে সর্দার আসবে। তখন মোহনের শাস্তি হবে। এবার

নিশ্চয় দারুণ শাস্তি হবে।

মেঘার মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে যে-সব মিথ্যা কথাগুলো বলছিল, সবই মোহনের কানে গিয়েছে। মোহন তার গলা টিপে ধরে তাকে নাকি অজ্ঞান করে ফেলে পালিয়েছিল। এ ধরনের ছেলেকে সর্দার অল্পে ছাড়বে এ রকম মনে হয় না।

যা হবার হবে, মোহন আর ভাবতে পারে না। দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে মোহন চোখ বুজল। ক্লান্ত দেহে ঘুম আসতে মোটেই দেরি হলো না।

মোহন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে অন্ধকার ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে।

॥ আট ॥

ঘটাং ঘট। জোর শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

জন পাঁচ-ছয় কথা বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল। মেঘা আছে, সঙ্গে একজন কালো বেঁটে চেহারার লোক, বোধহয় সেই লোকটাই সর্দার। ঘুম-চোখে মোহন তাদের দেখল।

ভোরের দিকে সে স্বপ্ন দেখছিল, তাকে সাপে কামড়েছে। আর বেঁচে নেই।

সেই সর্দার গোছের লোকটা বলল, আমরা যে সময় দিয়েছিলাম, সেটা তিন দিন হলো পার হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে ছেলেটার বাপের টাকা দেবার কোন ইচ্ছা নেই। সেই টিকিটিকিটা বোধহয় বুঝিয়েছে যে, টাকা দেবার দরকার নেই। আমাদের শায়েস্তা করে দেবে। ব্যস, আর আমাদের অপেক্ষা করার দরকার নেই। সেই টিকটিকিটা আমাদের কম হয়রানি করেনি। দু'বার আমাদের আস্তানা বদল করিয়েছে।

সর্দার একটু থামতেই মেঘা বলল, শয়তান ছেলেটা কাল রাতে আমার মায়ের গলা টিপে অজ্ঞান করে দিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আমাদের হাত থেকে যাবে কোথায়? ধরে আনা হয়েছে।

সর্দার রক্তচক্ষু মেলে মোহনের দিকে একবার দেখল। তারপর বলল, হুঁ, একেবারে বিচ্ছু। ওখানেও একবার দারোয়ানের মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে পালাবার চেষ্টা করেছিল। যাক, আর পালাতে হবে না।

আজই তাহলে সব ঠিক করে ফেলবে?

মেঘার কথার উত্তরে সর্দার বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ফেলে রাখছি না। তুই সব ঠিক করে রাখ। দুপুরের দিকে আমরা কাজ শেষ করব।

বাইরে গোটা কয়েক কাক ডেকে উঠল। ভোর হয়ে আসছে।

এখানকার দলের আর সবাইকে জড়ো হতে বলেছিস ?

হ্যাঁ সর্দার। সবাই আসবে।

ঠিক আছে। সর্দার বেরিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল।

জয় মা চণ্ডেশ্বরী, মা মা মা! বাইরে অদূরে বিকট কণ্ঠস্বর। আশপাশের গাছপালা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল।

সর্দার জিজ্ঞেস করল, ও কে ?

কি জানি, বুঝতে পারছি না।

অদূরে ঝোপের ভিতর একটা ভাঙা মন্দির প্রায় ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে। ভিতরে শুধু একটা মূর্তি দেখা যায়। কালীমূর্তিই হবে, তবে রংটা কালো নয়, হলুদ।

এ মন্দিরে অনেক দিন কেউ আসে না। সাপখোপের আস্তানা হয়েছে।

মূর্তির ঠিক সামনে লাল রংয়ের কাপড় পরা এক সন্ন্যাসী। মাথায় সাদা ধবধবে চুল জটার আকারে পিঠে নেমেছে। বুক পর্যন্ত বকের পালকের মতন সাদা দাড়ি। তুটো হাত কোলের ওপর। চোখ বোজা। মুখে অবিরাম ডাক—মা মা মা!

সর্দারকে নিয়ে মেঘা আর তার সঙ্গীরা একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সর্দার প্রশ্ন করল, এ আবার কে ?

মেঘা উত্তর দিল, কি জানি, আগে তো কোনদিন সাধু-সন্ন্যাসী এ মন্দিরে দেখিনি। বহুদিন এ মন্দির জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে।

বেশ জবরদস্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু দেখলে ভক্তি হয়। চল, গিয়ে বসি।

সবাই এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের চাতালে বসল।

সর্দার ঢিপ করে প্রণাম করে বলল, পেন্নাম হই সাধুবাবা।

সন্ন্যাসী চোখ খুলল। মুখ ঘুরিয়ে এদের দিকে দেখে বলল, কল্যাণ হোক বাবা তোমাদের। কাজে জয়লাভ হোক। সব বাধা

দূরে সরে যাক।

সর্দারের দেখাদেখি বাকি সবাই সোজা হয়ে শুয়ে প্রণাম করল।

একটা ভিক্ষে আছে বাবা! সর্দার হাত জোড় করে বলল।

কি বলো? আমি হিমালয়ে তপস্যা করছিলাম। হঠাৎ বাঘছাল কেঁপে উঠল। বার বার তিনবার। তখনই বুঝতে পারলাম কারো বিপদ হয়েছে। আমাকে নেমে আসতে হবে। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই মন্দির আমার খুব ভাল লাগল। চণ্ডেশ্বরীর মন্দির। বহু বছরের পুরনো, একেবারে জাগ্রত দেবী। কিন্তু অনেক দিনের অযত্নে মায়ের এই অবস্থা। এই চণ্ডেশ্বরী মায়ের পা ছুঁয়ে বিশে ডাকাত, নিমে ডাকাত রোজ ডাকাতি করতে যেত। তাদের গায়ে কোনদিন পুলিশের গুলী লাগত না।

সর্দার বলল, আপনি আমাদের জন্যও মায়ের পুজোর আয়োজন করুন বাবা। যা দরকার হয় এনে দেবো।

ঠিক আছে, আয়োজন করো। আমি বেলা দশটা থেকে পুজোয় বসব।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সর্দারের কথামতো এক-একজন এক-এক দিকে ছুটল।

সন্ন্যাসী আসন ছাড়ল না। মাঝে মাঝে শুধু সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল। মা চণ্ডেশ্বরী, এতদিন ঘুমিয়ে আছিস। এবার জাগ মা!

ন'টা বাজতে না বাজতে মন্দিরের চাতাল লোকে ভরে গেল। নানা রকমের ফল এল, ফুল এল, বেলপাতা। লোকেরা পুজোর ফল কাটতে বসল।

উঠোনে কুচকুচে কালো একটা ছাগলের বাচ্চা এনে বাঁধা হলো।

ওদিকে মোহন ঘরে একলা বন্দী। সবাই ব্যস্ত থাকায় তাকে খেতে দেবার কথা বোধহয় কারও মনে নেই। কিংবা তার শাস্তি হিসাবেই হয়তো খাওয়া বন্ধ। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি

করতে লাগল।

বিষের জ্বালা তো আছেই, তাছাড়া সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠেছে। কাঁটাগাছগুলো বোধহয় বিষাক্ত ছিল। অনেক জায়গা পেকে উঠেছে।

মাঝে মাঝে কানে সন্ন্যাসীর হুঙ্কার আসছে। বাইরে অনেক-গুলো লোকের গলার শব্দ, পায়ের আওয়াজ। কিন্তু দেখবার কোন উপায় নেই।

মোহন পায়চারি থামিয়ে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

প্রায় দশটা নাগাদ সন্ন্যাসী ইশারায় সর্দারকে ডাকল।

সর্দার কাছেই ছিল, একেবারে সন্ন্যাসীর পাশে গিয়ে বসল।

সন্ন্যাসী বলল, তোকে একটা কথা তখন বলতে ভুলে গিয়েছি।

বলুন বাবা!

কথাটা একটু গোপনীয়।

আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বলির জন্য তো ওই পাঁঠা এনেছিস?

হ্যাঁ বাবা। মায়ের পুজোয় কালো পাঁঠাই তো লাগে।

সে সব ঠিক আছে, কিন্তু মায়ের একটা আদেশ হয়েছে।

মায়ের আদেশ?

হ্যাঁ, ধ্যানে বসে সেই আদেশ পেলাম।

কি বলুন!

অনেকদিন মায়ের তেষ্টা মেটেনি। পাঁঠায় হবে না।

তাহলে কাল মোষ নিয়ে আসব।

উঁহু। সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল।

তবে?

মায়ের মানুষের রক্ত প্রয়োজন।

মানুষের রক্ত?

এবার সর্দার একটু পিছিয়ে গেল। মানুষ যোগাড় করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া হাতে তো বেশী সময়ও নেই।

আরো কথা আছে। সন্ন্যাসী আবার মাথাটা সর্দারের দিকে হেলিয়ে দিল। এমন ছোকরা যোগাড় করতে হবে যার বয়স পনরোর বেশী নয়।

তার মানে, কচি ছেলে?

হ্যাঁ।

সর্দার বলল, আমার দলের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

সর্দার নেমে এসে দলের মধ্যে দাঁড়াল। বাছা বাছা কয়েকজনকে কাছে ডাকল।

সবাই চুপচাপ।

একজন বলল, এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলে যোগাড় করা মুশকিল।

ছেলে তো অনেক রয়েছে সর্দার, কিন্তু সব তো কানা, খোঁড়া কিংবা নুলো। মায়ের পুজোয় তো এসব লাগবে না।

উহুঁ, ওসব চলবে না। তা ছাড়া, এত অল্প সময়ে ওদের পাচ্ছিস কোথায়?

মেঘা কাছেই ছিল। সে এসে বলল, সর্দার, হয়ে গেছে।

সবাই চমকে উঠল।

সর্দার খিঁচিয়ে উঠল, কি আবার হয়ে গেল?

ছেলের খোঁজ মিলেছে।

মিলেছে? কোথায় পেলি?

কেন, ঘরের মধ্যে যে ছোকরা বন্দী রয়েছে!

সর্দার মেঘার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, সাবাস মেঘা, কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। ও আপদ খতম হয়ে যাওয়াই ভাল। আমাদের অনেক ভুগিয়েছে। দাঁড়া, বাবাকে বলে আসি।

সর্দার সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এসে বলল, বাবা, পাওয়া গেছে।

আনন্দে সন্ন্যাসী উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সবই মায়ের ইচ্ছা। কোথায় পাওয়া গেল?

কাছেপিঠেই ছিল।

অক্ষত দেহ তো? কানা-খোঁড়া নয়?

আজ্ঞে না।

জয় মা চণ্ডেশ্বরী। মা মা মা! সন্ন্যাসী লম্বা হয়ে শুয়ে প্রণাম করল।

দেখাদেখি আর সবাই।

এবার যে একটা কাজ করতে হবে! সন্ন্যাসী আবাব সর্দারের দিকে ফিরল।

বলুন বাবা!

ছেলেটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আয় এখানে।

সর্দার মেঘাকে আদেশ দিল।

মিনিট কুড়ির মধ্যে মেঘা মোহনকে পানাপুকুরে চুবিয়ে নিয়ে এল। মোহন শীতে নয়, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

সন্ন্যাসী আড়চোখে একবার মোহনের দিকে দেখে বলল, ওরে এটাকে মুছিয়ে দে। এসব খুলে একটা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।

মেঘা মোহনকে মুছিয়ে একটা ধুতি পরিয়ে নিয়ে এল।

বসিয়ে দে আমার পাশে।

মোহনকে সন্ন্যাসীর পাশে বসানো হলো। আর একপাশে সদার। মোহনের আশেপাশে সবাই ঘিরে বসল। অবশ্য এত লোকের মাঝখান দিয়ে পালানো সম্ভব নয়, তবু সাবধানের মার নেই।

মোহনের কপালে সন্ন্যাসী সিঁদুরের টিপ দিল। গলায় জবা-ফুলের মালা।

সব কালীপূজা রাত্রে হয়, চণ্ডেশ্বরী পূজা হয় দিনে। তাই বুঝি দেবীর গায়ের রং কালো নয়।

স্নান করিয়ে নিয়ে আসবার সময় মোহন উঠানে হাড়িকাঠ দেখতে পেয়েছিল।

সামনে দেবীমূর্তি। সন্ন্যাসী পূজা করছে। তাকে এভাবে স্নান করিয়ে আনা হলো, এসবের মানে বুঝতে তার একটুও দেরি

হলো না। আর নিস্তার নেই। আজই সব শেষ। মোহন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

সর্দার ধমক দিল, চুপ কর। পুজোর সময় যত ঝামেলা বাধাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বলল, আরে কাঁদুক কাঁদুক, এই তো শেষ কান্না। কেঁদে নিক।

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পুজো আরম্ভ হলো। সন্ন্যাসী আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পর মূর্তির দিকে জবাফুল ছুঁড়ে দিল। তারপর আসনে বসে মোহনকে জিজ্ঞেস করল, কি রে, কি নাম তোর?

মোহন তখনো ফোঁপাচ্ছে।

সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে উঠল, কান্না থামা। নাম কি বল?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মোহন বলল, মোহন সরকার।

বাপের নাম?

অভয় সরকার।

কত বয়স?

তের।

ঠিক আছে।

আবার মন্ত্র পড়া শুরু হলো।

সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তাহলে বলিটা সেরে ফেলা যাক।

সর্দার এগিয়ে মোহনের কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী বলল, দাঁড়া, আগে ওকে পিছমোড়া করে বাঁধ।

একজন ছুটে গিয়ে জঙ্গল থেকে শক্ত লতা নিয়ে এসে মোহনের দুটো হাত বাঁধল।

মোহনের আর কাঁদবারও শক্তি নেই যেন। তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘটিতে জল নিয়ে সন্ন্যাসী হাড়িকাঠের কাছে নেমে এল।

হাড়িকাঠের ওপর জলের ফোঁটা ছিটিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো।

হাড়িকাঠের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে চকচকে প্রকাণ্ড খাঁড়া।

ওরে, কেউ এটাকে আগে বেলগাছটার সঙ্গে বাঁধ। বহুদিন বলি হয়নি, আগে হাড়িকাঠটা শোধন করে নিই। তোরা সব এগিয়ে আয়।

আশপাশের সবাই হাড়িকাঠ ঘিরে গোল হয়ে বসল।

সন্ন্যাসী একবার চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর হাতের ঘটিটা হাড়িকাঠের পাশে নামিযে রেখে সূর্যের দিকে চোখ তুলে প্রণাম করল। প্রণাম শেষ হতে চাদরের ভিতর থেকে একটা বিউগল বের করল। সূর্যের দিকে মুখ তুলে বিউগলে ফু দিল। ঠিক যুদ্ধের সময় যেমন বাজনা হয়, সেই রকম। বিউগলের শব্দে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তালে তালে সবাই দুলতে লাগল।

উৎসব-আনন্দে সকলে এত মেতে আছে যে ধুলো উড়িয়ে দূর থেকে বিদ্যুৎগতিতে যে কয়েকটা জীপ আসছে, সেটা কারো খেয়ালই নেই।

খেয়াল যখন হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সমস্ত দলটাকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে পিস্তল আর বন্দুক। সন্ন্যাসীর হাতেও একটা পিস্তল দেখা গেল। পালাবার কোন পথই নেই।

খাঁড়া হাতে লোকটা পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলী এসে তার কবজিতে লাগতেই সে চীৎকার করে মাটিতে বসে পড়েছিল।

সন্ন্যাসী পরিধানের লাল কাপড় সরিয়ে ফেলল। খুলে ফেলল চুল দাড়ি আর রুদ্রাক্ষের মালার গোছা। এবার পারিজাত বক্সিকে পরিষ্কার চেনা গেল।

একটা জীপ থেকে মোহনের বাবা নেমে এল। ততক্ষণে একজন পুলিশ মোহনের লতার বাঁধন খুলে দিয়েছে।

মোহন, আমার মোহন রে! ইস্, এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর? মোহনের বাবা ছেলেকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল।

মোহনও কেঁদে উঠল, বাবা, বাবা! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর কোনদিন আমি এমন করে পালাব না।

তারপর ঐ ছেলেধরা দলটার কি শাস্তি হলো, অন্যান্য কানা খোঁড়া আর নুলো ছেলেদের উদ্ধার করে কিভাবে আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা তো তোমরা খবরের কাগজেই পড়েছ।

—